ইউনিট
৫

বিভিন্ন দেশে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
Management System in Different Countries

ভূমিকা

ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান ব্যতিরেকে কোনো প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা তথা সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ধরন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন করা আবশ্যক। বর্তমান যুগ হলো বিশ্বায়নের যুগ। তাই শিল্প-সংস্কৃতি ও ব্যবসায়-বাণিজ্য নির্দিষ্ট কোনো দেশে সীমাবদ্ধ নাই। এটি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়েছে। এতে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতাও রয়েছে। তাই প্রতিযোগিতায় সফলতার সাথে টিকে থাকতে হলে চাই ব্যবস্থাপনা দক্ষতা। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কীভাবে ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়, সে সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা আবশ্যক। এই ইউনিটে তাই বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়:	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ	
পাঠ-৫.১:	বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি: এক মালিকানা; পারিবারিক ও যৌথ পারিবারিক ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা, অংশীদারি ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা; কোম্পানির সংজ্ঞা; বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ
পাঠ-৫.২:	পরিচালকের যোগ্যতা; পরিচালক নিয়োগ,; পরিচালকের অপসারণ; পরিচালক পরিষদের কার্যাবলি, পরিচালকের ক্ষমতা; পরিচালকের দায়িত্ব
পাঠ-৫.৩:	ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যাবলি, পরিচালকের পদশূন্যতা; ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি কী; ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধির কার্য বা ভূমিকা; ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ
পাঠ-৫.৪:	বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে কোম্পানি ব্যবস্থাপনার ধরন, বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ বা চর্চা
পাঠ-৫.৫:	জাপানের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি; যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি; দক্ষিণ কোরিয়ার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি; ফ্রান্সের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
পাঠ-৫.৬:	জামার্নির ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি; চীনের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি; যুক্তরাজ্যের ব্যস্থাপনা পদ্ধতি
পাঠ-৫.৭:	ভারতের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

পাঠ-৫.১ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি: এক মালিকানা; পারিবারিক ও যৌথ পারিবারিক ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা; অংশীদারি ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা; কোম্পানির সংজ্ঞা; বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ

Management System of Sole Proprietorship Business; Management of Family and Joint Family Business; Defination of Joint Stock Company; Features of a Company Organization; Types of Joint Stock Company

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- একমালিকানা ও যৌথ পারিবারিক ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- অংশীদারি ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- কোম্পানির সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- কোম্পানির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- কোম্পানির ধরন সম্পর্কে জানতে পারবেন।

এক মালিকানা ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা

Management System of Sole Proprietorship Business

এক মালিকানা ব্যবসায়ের বহু প্রাচীন ও সহজতম ব্যবসায় সংগঠন। এ ব্যবসায়ের মালিক একজন, তার কোনো অংশীদার থাকেনা। সুতরাং যে ব্যবসায়ের মালিক একজন ব্যক্তি, তাকে একমালিকানা ব্যবসায় বলে। মালিক একাই মূলধনের যোগান দেন, ব্যবসায় পরিচালনা করেন এবং একাই মুনাফা ভোগ করেন। আবার লোকসান হলে তিনি একাই তা বহন করেন। এমনকি এজন্য তার ব্যক্তিগত সম্পত্তিও পাওনাদারগণ নিয়ে যেতে পারেন। সুতরাং একমালিকানা ব্যবসায় মালিকের দায়-দায়িত্ব অনেক। তাই মালিককে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ব্যবসায় পরিচালনা করতে হয়। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান; যেমন: মুদি ও স্টেশনারি দোকান, পান-বিড়ির দোকান, হোটেল-রেস্টুরেন্ট, ওষুধের দোকান, পাইকারি ব্যবসায়, ঠিকাদারি প্রভৃতি এক মালিকানা ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত।

ব্যবস্থাপনা

Management

এক মালিকানা ব্যবসায়ের গঠন ও এর পরিচালনা একই সূত্রে গ্রথিত। কারণ, মালিককেই এর সমুদয় কার্যাবলি সম্পাদন করতে হয়। প্রয়োজনীয় অর্থ ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ থেকে শুরু করে এ গুলোর সঠিক প্রয়োজনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ তাকেই গ্রহণ করতে হয়। ব্যবসায়ের পরিসর একটু বড় হলে দুচারজন লোকবলের প্রয়োজন হলে তিনি উপযুক্ত কর্মী বাছাই করে নাই। এ ছাড়াও ব্যবসায়ের কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কর্মীদেরকে উৎসাহ প্রদান, বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত নির্দেশ দান ও নিয়ন্ত্রণের জন্য তাকেই কার্যসম্পাদন করতে হয়। সুতরাং বলা যায়- তার ব্যবসায়ের তিনিই সংগঠক, পরিচালক ও ব্যবস্থাপক। সুতরাং তার ব্যবস্থাপনা দক্ষতার উপরই ব্যবসায়ের সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এক মালিকানা ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনার কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এগুলো নিম্নরূপ:

১. মালিক নিজেই ব্যবসায়ের সংগঠন করেন।
২. তিনি এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাই দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়। সেই সাথে গোপনীয়তা রক্ষা করাও সম্ভব হয়।
৩. ব্যবসায়ের পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব তারই উপর।
৪. মালিক একাই লাভ-লোকসানের ভাগীদার।
৫. কর্মীদেরকে কার্যসম্পাদনের নির্দেশনা মালিকের নিকট থেকেই আসে।

৬. কর্মীদের উপর তিনিই কর্তৃত্ব হস্তান্তর করেন। ফলে এক্ষেত্রে জটিলতা নাই।
৭. কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা তুলনামূলকভাবে কম। কারণ, একদিকে ব্যবসায়ের পরিধি তুলনামূলকভাবে ছোটো, অন্যদিকে তাদের জন্য নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো ও চাকুরির নিয়ম-কানুন থাকে না।
৮. এ ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কর্মীদের আসা-যাওয়া (Labour Turnover) তুলনামূলকভাবে বেশি। কারণ, এক্ষেত্রে মালিকের স্বেচ্ছাচারিতা কাজ করে। কর্মী নিয়োগ ও ছাঁটাইয়ের বিষয়টি মালিকের নিকট কোনো ব্যাপারই নয়।
৯. সাধারণত: হিসাব সংরক্ষণের দায়িত্ব মালিকের হাতেই থাকে।
১০. কর্মীদের নির্দেশনা, যোগাযোগের কাজ, বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব মালিক নিজেই পালন করে থাকে।
১১. খুব কমসংখ্যক মালিকের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ বা শিক্ষা থাকে।
১২. সর্বোপরি ব্যবসায়ের সফলতা ও ব্যর্থতা মালিকের নিজস্ব যোগ্যতা ও দক্ষতার উপর নির্ভর করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, এক মালিকানা ব্যবসায় গঠন, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার কাজ অত্যন্ত সহজ। মালিক নিজেই ব্যবসায় সংগঠন থেকে শুরু করে ব্যবস্থাপনার সমস্ত কাজ সম্পাদন করে থাকেন। ফলে সব কিছুই দ্রুত করা সম্ভব হয়। ক্ষেত্র বিশেষে কোনো কোনো মালিক দক্ষ ব্যবস্থাপক নিয়োগ করেন। সে ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের পরিধি বৃদ্ধি পায়। এ ক্ষেত্রে আর একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, মালিকের সাথে ভোক্তা, শ্রমিক কর্মচারীদের নিয়ে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে ভোক্তাদের পছন্দসই পণ্য সরবরাহ করে ব্যবসায়ের উন্নতি করা সম্ভব।

পারিবারিক ও যৌথ পারিবারিক ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা

Management of Family and Joint Family Business

যে ব্যবসায়ের মালিকানা কোনো পরিবারের অধীনে তাকে পারিবারিক ব্যবসায় বলে। আর যৌথ পারিবারিক ব্যবসায় বলতে বুঝায় এমন ব্যবসায়কে যার মালিকানা থাকে কয়েকটি পরিবারের লোকদের অধীনে। পরিবারের সদস্যগণ জন্মসূত্রে সকলেই এ ব্যবসায়ের মালিক হয়ে থাকে। সেই সূত্রে তারা সকলেই লাভ-লোকসানের ভাগীদার। সুতরাং দেখা যায় যে, ব্যবসায়ের মালিকানার জন্য পরিবারের সদস্য হতে হবে। বয়স কিংবা ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচ্য নয়। পরিবারের প্রধান ব্যক্তিই ব্যবসায়ের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করেন। অন্যান্য সদস্যরা তাকে সাহায্য করে থাকে। এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, পারিবারিক ব্যবসায় ও অংশীদারি ব্যবসায় এক নয়। পারিবারিক ব্যবসায়ে চুক্তির প্রয়োজন হয় না, অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে চুক্তির প্রয়োজন হয়।

যৌথ পারিবারিক ব্যবসায়

Joint Family Business

পরিবারের সদস্যগণ পর্যায়ক্রমে বিভক্ত হয়ে আলাদা পরিবার গঠন করে। কিন্তু ব্যবসায়ের মালিকানা ভাগ না হয়ে একই থাকে। তখন এটিকে যৌথ পারিবারিক ব্যবসায় বলে। অর্থাৎ, একাধিক পরিবার যখন কোনো ব্যবসায়ের মালিক হয় তখন তাকে যৌথ পারিবারিক ব্যবসায় বলে। এটিও পরিপূরক ব্যবসায়ের মতোই। তারা আলাদা পরিবারের হলেও ব্যবসায়ের মালিকানা স্বত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে। আমাদের দেশে একসময় হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে এ ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রচলন ছিল। তবে এখন খুব একটা দেখা যায় না।

পারিবারিক ও যৌথ পারিবারিক ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা

Management of Family & Joint Family Business

পারিবারিক ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পরিবারের সদস্যদের উপর থাকে। সাধারণত পরিবারের কর্তা ব্যক্তিই প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। পরিবারের বাইরের লোকদের হাতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়ার নজির খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। বাঙালি মুসলমানদের পারিবারিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তথা পারিবারিক ব্যবস্থাপনার প্রচলন পূর্বেও খুব একটা ছিল না, এখনও নাই। তবে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে দেখা যায় যে, অবাঙালি ব্যবসায়ীগণ ব্যবসায়

পরিচালনার দায়িত্ব নিজেরাই পালন করত। পরিবারের মধ্যে ব্যবসায় পরিচালনার যোগ্য লোক পাওয়া না গেলে তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত কোনো লোককে এ দায়িত্ব দেওয়া হতো। সম্প্রদায়ের বাইরের লোকদের হাতে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব খুব কমই দেওয়া হতো। এর কারণ হলো তাদের ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনার ধরন ছিল পরিবার, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ভিত্তিক। মুনাফা অর্জন ছাড়াও তাদের পরিবার ও সম্প্রদায়ের লোকদের কর্মসংস্থান ছিল ব্যবসায়ের অন্যতম লক্ষ্য। সুতরাং দেখা যায় যে, এ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনার "পারিবারিক ব্যবস্থাপনা" মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এ পারিবারিক ব্যবস্থাপনার কারণেই ব্যবস্থাপনা পেশা হিসাবে তেমন অগ্রগতি লাভ করেনি।

পারিবারিক ব্যবস্থাপনার সমস্যা

Problems of Management of Family Business

প্রতিষ্ঠানে পারিবারিক ব্যবস্থাপনায় কতিপয় সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। এগুলো নিম্নরূপ:

১. **কার্যবন্টন ও বিশেষীকরণ (Work Distribution & Specialization):** পারিবারিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কার্যবন্টন ও বিশেষায়নে সমস্যার সৃষ্টি হয়। কারণ, পরিবারের মধ্যে সব কাজে দক্ষ লোক পাওয়া যায় না। ফলে একজন সদস্যের উপরই সমস্ত দায়িত্ব বর্তায়। যে ব্যক্তি সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়োজিত, তাকে নীচের স্তরের কাজও তদারকি করতে হয়। এতে ছোটোখাটো অনেক বিষয়ে প্রচুর সময় নষ্ট হয়।

২. **অগণতান্ত্রিক (Undemocratic):** পারিবারিক ব্যবস্থাপনা অগণতান্ত্রিক। কারণ, এ ক্ষেত্রে কর্মীদের সুযোগ-সুবিধার তোয়াক্কা করা হয় না। উপরন্তু তাদের সাথে প্রভূত্বমূলক আচরণ করা হয়। তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রতি মোটেই নজর দেওয়া হয় না। এতে কর্মচারীদের মনোবল ভেঙে যায়।

অংশীদারি ব্যবসায়

Management of Partnership Business

অংশীদারি ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সাধারণত: অংশীদারগণই পালন করে থাকে। অর্থাৎ, তারা সকলে মিলে অথবা সকলের মধ্য থেকে একজনকে ব্যবস্থাপক নিয়োগ করা হয়, যার উপর ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। তিনি তার কাজের জন্য সকল অংশীদারদের নিকট দায়ী থাকেন। তাকে মাসিক নির্দিষ্ট হারে বেতন প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, তাকে অত্যন্ত দক্ষ ও বিচক্ষণ হতে হয়। কারণ, দক্ষ পরিচালনার উপরই ব্যবসায়ের সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে। তবে ব্যবস্থাপককে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করা হয়, যারা প্রতিষ্ঠানে দৈনন্দিন কার্যাবলি পরিচালনা ও সম্পাদনের দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক অংশীদার অন্যান্য অংশীদারদের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করে থাকে। অনেক সময় এ কাজের জন্য অংশীদারদের নিয়ে "ব্যবস্থাপনা কমিটি" (Management Committee) গঠন করা হয়ে থাকে। যদিও অংশীদারি ব্যবসায়ে কার্য বিশেষায়নের সুযোগ কম, তথাপি ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য কিংবা অন্যান্য অংশীদারদের বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়ে কার্য বিশেষায়ন করা হয়ে থাকে। এতে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, অংশীদারি ব্যবসায়ে অনেক দক্ষ লোকের সমাগম ঘটে বিধায় এ ক্ষেত্রে দক্ষ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়। তা ছাড়া, প্রয়োজনে দক্ষ ও অভিজ্ঞ নতুন সদস্যও অন্তর্ভুক্ত করে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়ানো যায়। আর ব্যবস্থাপনা দক্ষ হলে প্রতিষ্ঠানের সফলতা নিশ্চিত।

যৌথ মূলধনি কোম্পানির সংজ্ঞা

Defination of Joint Stock Company

যৌথ মূলধনি কোম্পানি কেবল একটি মুনাফা অর্জনকারী ব্যবসায় সংগঠনই নয়; কোম্পানি সংগঠন একটি কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তাবিশিষ্ট কোম্পানি, আইন সৃষ্ট ব্যবসায় সংগঠন। নীচে কোম্পানি সংগঠনের কতিপয় সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো-

১৯৯৪ সালের বাংলাদেশের বলৎযোগ্য কোম্পানি আইনের ২ (১) (ঘ) ধারায় বলা হয়েছে যে, 'কোম্পানি বলতে কোম্পানি আইনের আওতায় গঠিত ও নিবন্ধিত অথবা কোনো বিদ্যমান কোম্পানিকে বোঝায়।' (Company means a company formed and registered under this act or any existing company).

বিচারপতি জন মার্শাল- এর মতে, 'কোম্পানি হলো এমন একটি কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা যা অদৃশ্য স্পর্শ্যাতীত তবে আইনের মাঝে বিদ্যমান।' (A Company is an artificial being invisivble, intangible and existing only in contemplation of law).

অধ্যাপক এম. এইচ. বোখারীর মতে, 'মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য কতিপয় ব্যক্তি দ্বারা সম্মিলিতভাবে আইনসম্মত উপায়ে যে ব্যবসায় গঠিত হয় তাকে যৌথমূলধনি কোম্পানি বলে।'

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে,

১. কোম্পানি একটি আইনসৃষ্ট সংগঠন;
২. কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তার অধিকারী;
৩. আস্থামূলক যৌথ প্রতিষ্ঠান;
৪. চিরন্তন অস্তিত্বের অধিকারী;
৫. মালিকানা থেকে ব্যবস্থাপনা পৃথক।

সুতরাং বলা যায় যে, মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ দায়ের ভিত্তিতে আইনসৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তার অধিকারী এমন এক ধরনের বৃহদায়তন ব্যবসায় সংগঠন, যা চিরন্তন অস্তিত্ব সম্পন্ন তাকে যৌথমূলধনি কোম্পানি বলা হয়।

কোম্পানি সংগঠনের বৈশিষ্ট্য

Features of a Company Organization

কোম্পানি সংগঠন অন্যান্য ব্যবসায় সংগঠন থেকে কতিপয় বৈশিষ্ট্যের কারণে আলাদা। এ বৈশিষ্ট্যগুলো আইনগত বৈশিষ্ট্যে ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নীচে সেগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো-

ক. **আইনগত বৈশিষ্ট্য (Legal Feature):**কোম্পানির আইনগত বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপঃ

১. **পৃথক ও কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তা (Seperate and Artificial Personality):** কোম্পানি একটি কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা হিসাবে বিবেচিত হয় যা সদস্যের সত্তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আইন অনুযায়ী এটি কৃত্রিম ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা ভোগ করে থাকে। এ কৃত্রিম সত্তাবলে কোম্পানি নিজ নামে অন্যের সাথে যেমনি লেনদেন করতে পারে তেমনি কারও বিরুদ্ধে মোকদ্দমাও করতে পারে।

২. **চিরন্তন ব্যক্তি সত্তা (Perpetual Succession):** আইনের দৃষ্টিতে কোম্পানি চিরন্তন অস্তিত্বের অধিকারী এক কৃত্রিম সত্তা। কোম্পানির সদস্য বা শেয়ার মালিকদের অস্তিত্বের উপর এর অস্তিত্ব নির্ভর করে না। কোম্পানির মালিকানা বা সদস্য পদের পরিবর্তনে এর অস্তিত্ব বিপন্ন হয় না। কেবল কোম্পানি আইনের বিধান অনুযায়ী কোম্পানির বিলোপসাধন করা হলেই এর অস্তিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।

৩. **আইনসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান (Formed by Law):** কোম্পানি আইন দ্বারা এ প্রতিষ্ঠান সৃষ্ট হয়। বাংলাদেশে যৌথমূলধনি কোম্পানিসমূহ ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। উক্ত আইনের ২.১ (ঘ) ধারায় বলা হয়েছে যে, 'কোম্পানি বলতে এ আইনের অধীনে গঠিত এবং নিবন্ধিকৃত কোনো কোম্পানি বা কোনো বিদ্যমান কোম্পানিকে বুঝায়।' কাজেই কোম্পানিকে সম্পূর্ণ আইনসৃষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান বলা যায়।

৪. **বাধ্যতামূলক নিবন্ধন (Compulsary):** কোম্পানির নিবন্ধন আইনগত বাধ্যতামূলক। কোম্পানি আইন অনুসারে কোম্পানিকে অবশ্যই নিবন্ধিত হতে হবে। নিবন্ধন ব্যতীত কোনো কোম্পানি গঠিত এবং পরিচালিত হওয়া অবৈধ।

৫. **সদস্য সংখ্যা (No of Member):** কোম্পানি আইনের বিধান অনুযায়ী কোম্পানির সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হয়ে থাকে। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে এর সদস্য সংখ্যা ন্যূনতম দুই এবং সর্বাধিক ৫০ জনে সীমাবদ্ধ থাকে এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সংখ্যা ৭ এবং সর্বোচ্চ শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে।

৬. **সীমিত দায় (Limited Liability):** কোম্পানির সদস্য বা শেয়ারহোল্ডারদের দায় সীমিত। একজন সদস্যের দায় তার শেয়ার দ্বারা সীমিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ এর সদস্যদের দায় তাদের ক্রীত শেয়ারের মোট মূল্য পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে।

৭. **সাধারণ সীলমোহর (Common Seal):** প্রতিটি কোম্পানির নামাঙ্কিত একটি সাধারণ সীলমোহর থাকে। কারণ, কোম্পানি স্বতন্ত্র ও কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা নিয়ে পরিচালিত হয়।

৮. **শেয়ার হস্তান্তরযোগ্যতা (Transferability of Share):** কোম্পানির শেয়ারগুলো অবাধে হস্তান্তরযোগ্য। শেয়ারের হস্তান্তরের সাথে কোম্পানির মালিকানায়ও পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ শেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে শেয়ার ক্রয়কারী কোম্পানির লভ্যাংশের মালিকানা লাভ করে।

৯. **মালিকানা থেকে ব্যবস্থাপনা পৃথক (Seperation Management from Ownership):** কোম্পানির মালিকানা থেকে এর ব্যবস্থাপনা পরিচালনা সম্পূর্ণ পৃথক। কোম্পানি আইন অনুযায়ী নির্বাচিত পরিচালকমণ্ডলী বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক কোম্পানির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কার্যসম্পাদন করে থাকে।

১০. **বিধিবদ্ধ দায়িত্ব (Statutory Responsibility):** কোম্পানি আইনের বিধান মোতাবেক কোম্পানিকে এর খাতাপত্র সংরক্ষণ, হিসাবপত্র তৈরি ও নিরীক্ষণ, সভা আহবান ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতগুলো বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালন করতে হয়।

খ. অন্যান্য বৈশিষ্ট্য (Other Feature):

১. **বৃহদায়তন কারবার সংগঠন (Large Scale Enterprise):** কোম্পানি অন্যান্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মতো একটি বৃহদাকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। সদস্য সংখ্যা ও মূলধনের পরিমাণ অধিক হওয়ায় এ সংগঠন স্বাভাবিকভাবেই বৃহদাকার হয়ে থাকে।

২. **জটিল গঠন পদ্ধতি (Complex Formation):**কোম্পানি সংগঠনের গঠন পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল। কোম্পানি গঠনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট আইনানুগ আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়। কেননা কোম্পানি আইন অনুযায়ী কোম্পানি গঠিত হয়।

৩. **স্বেচ্ছামূলক সংস্থা (Voluntary Organization):** কোম্পানি একটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ব্যবসায়ী সংগঠন। মুনাফার উদ্দেশ্যে কতিপয় ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে এ কোম্পানি গঠন করে থাকে। যে কেউ ইচ্ছা করলেই শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে কোম্পানির মালিক হতে পারে, আবার কেউ ইচ্ছা করলেই শেয়ার হস্তান্তর করে বা বিক্রি করে ব্যবসায় হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারে।

৪. **গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা (Democratic Management):** কোম্পানির সংগঠনের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় গণতান্ত্রিক নীতিমালা অনুসৃত হয়। শেয়ার হোল্ডারগণের ভোটের মাধ্যমে কোম্পানির পরিচালকগণ নির্বাচিত হয়ে থাকে এবং তাদের দ্বারা কোম্পানি পরিচালিত হয়। উপরন্তু কোম্পানি শেয়ার হোল্ডারগণের অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে নীতি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

৫. **উদ্দেশ্যের অনমনীয়তা (Nonflexibility of Objective):**কোম্পানি কর্তৃক স্মারকলিপিতে এর যে উদ্দেশ্যাবলি বর্ণিত থাকে, তার বাইরে কোম্পানি কোনো কাজ করতে পারে না। এমনকি সকল শেয়ারহোল্ডারগণের অধিকাংশের একমত হলেও নির্ধারিত উদ্দেশ্যের বাইরে কোনো কাজ করতে পারে না।

৬. **লভ্যাংশ বণ্টন (Distribution of Dividend):** কোম্পানি অর্জিত মুনাফার একটা নির্দিষ্ট অংশ লভ্যাংশ হিসাবে কোম্পানির সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে শেয়ার মালিকদের মধ্যে আনুপাতিক হারে বণ্টিত হয়ে থাকে।

৭. **দ্বৈত করারোপ (Dual Tax):** কোম্পানির উপর সাধারণত দুইভাগে কর ধার্য থাকে। একবার এর অর্জিত মুনাফার উপর করারোপ করা হয়। দ্বিতীয়ত, শেয়ার মালিকদের প্রাপ্ত লভ্যাংশের উপর আবার কর প্রদান করতে হয়।

৮. **বিলোপসাধন (Winding Up):** যৌথ মূলধনি কোম্পানির গঠন যেমন আনুষ্ঠানিকতাপূর্ণ তেমনি এর বিলোপ-সাধনের ক্ষেত্রেও আনুষ্ঠানিকতা পালনের প্রয়োজন হয়। কোম্পানির সদস্য বা শেয়ারহোল্ডারগণ ইচ্ছা করলেই এর বিলোপসাধন করতে পারে না। কোম্পানি আইনের বিধান অনুযায়ী এর বিলোপ সাধন ঘটে।

কোম্পানি সংগঠনের প্রকারভেদ

Types of Joint Stock Company

কোম্পানির গঠন, প্রকৃতি, দায়, মালিকানা ইত্যাদির ভিত্তিতে যৌথ মূলধনি কোম্পানি নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়:

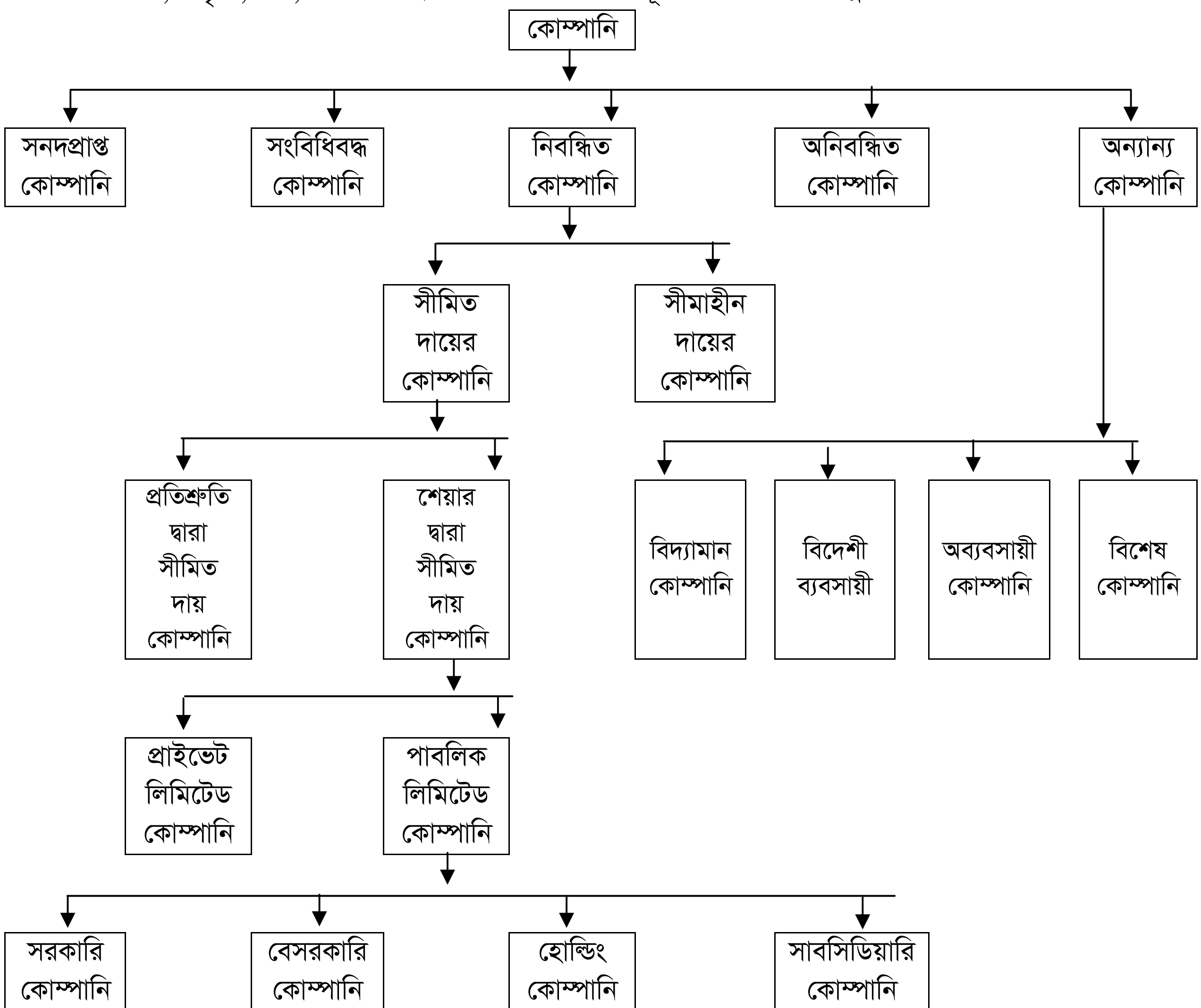

চিত্র: কোম্পানি সংগঠনের প্রকার

১. সনদপ্রাপ্ত কোম্পানি (Chartered Company): কোম্পানি আইন প্রণীত হওয়ার পূর্বে ইংল্যান্ডে রাজা বা রাণীর বিশেষ সনদ (Royal Charter) বা ঘোষণা বলে যে কোম্পানি গঠিত হতো, সে কোম্পানিকে সনদপ্রাপ্ত কোম্পানি বলা হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, চার্টার্ড ব্যাংক অব ইংল্যান্ড, চার্টার্ড মার্কেন্টাইল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া ইত্যাদি সনদপ্রাপ্ত কোম্পানির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

২. সংবিধিবদ্ধ কোম্পানি (Statutory Company): দেশের আইন সভা বা সংসদ অথবা রাষ্ট্র প্রধানের বিশেষ আইন বা অধ্যাদেশ বলে গঠিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত কোম্পানিকে সংবিধিবদ্ধ কোম্পানি বলা হয়। এ সকল কোম্পানি দেশের প্রচলিত কোম্পানি আইন দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত না হয়ে পাসকৃত বিশেষ আইন দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সাধারণত জনসাধারণের কল্যাণার্থে কোনো বিশেষ কার্যসম্পাদনের জন্যে এ সমস্ত কোম্পানি গঠন করা হয়ে থাকে। যেমন: বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াসা ও রাজউক ইত্যাদি।

৩. নিবন্ধিত কোম্পানি (Registered Company): কোম্পানি আইনের বিধান অনুযায়ী যে সকল কোম্পানি গঠিত ও নিবন্ধিত হয় তাকে নিবন্ধিত বা রেজিস্টার্ড কোম্পানি বলে। বাংলাদেশে যৌথ মূলধনি কোম্পানিগুলো ১৯৯৪ সালের কোম্পানির আইনের আওতায় গঠিত, নিবন্ধিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। উক্ত কোম্পানি আইনের ২-১ (ঘ) ধারায় বলা হয়েছে যে, 'কোম্পানি বলতে অত্র আইনের অধীনে গঠিত ও নিবন্ধনকৃত কোম্পানি বা বিদ্যমান কোম্পানিকে বুঝায়।' অর্থাৎ কোম্পানি আইন অনুযায়ী গঠিত ও কোম্পানি নিবন্ধক কর্তৃক নিবন্ধনকৃত কোম্পানিকেই নিবন্ধিত কোম্পানি বলা হয়ে থাকে।

নিবন্ধিত কোম্পানিকে দায়ের ভিত্তিতে আবার নিম্নোক্ত দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

ক. সীমিত দায় কোম্পানি (Limited Liability Company): যে কোম্পানির সদস্যদের দায় সীমাবদ্ধ থাকে তাকে সীমিত দায় কোম্পানি বলে। এরূপ কোম্পানির কোনো সদস্যকে নির্দিষ্ট দায়ের অতিরিক্ত দায় বহন করতে হয় না। সীমিত দায় কোম্পানি দুই ধরনের হতে পারে; যথা:

১. প্রতিশ্রুতি বা গ্যারান্টি দ্বারা সীমিত দায় কোম্পানি; এবং

২. শেয়ার দ্বারা সীমিত দায় কোম্পানি

১. প্রতিশ্রুতি বা গ্যারান্টি দ্বারা সীমিত দায় কোম্পানি (Company Limited by Guarantee): যে সীমিত দায়সম্পন্ন কোম্পানির সদস্যগণ তাদের ক্রয়কৃত শেয়ারের অভিহিত মূল্য ছাড়াও কোম্পানির অবসায়নকালে কোম্পানির দেনার নির্দিষ্ট অংশের দায় বহন করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে তাকে প্রতিশ্রুতি দ্বারা সীমিত দায় বা গ্যারান্টি দ্বারা দায় কোম্পানি বলে। বর্তমানে এ ধরনের কোম্পানির অস্তিত্ব নাই।

২. শেয়ার দ্বারা সীমিত দায় কোম্পানি (Company Limited by Shares): যে সীমিত দায়সম্পন্ন কোম্পানির সদস্যদের দায় তাদের ক্রয়কৃত শেয়ারের অভিহিত মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে তাকে শেয়ার দ্বারা সীমিত দায় কোম্পানি বলে। এ ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডারদের দায় শেয়ার বা শেয়ারের মূল্যের অতিরিক্ত অর্থের জন্য দায়ী করা যাবে না। অধিকাংশ যৌথ মূলধনি কোম্পানিই এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এ প্রকার কোম্পানির নামের শেষে 'লিমিটেড' শব্দটির ব্যবহার বাধ্যতামূলক। শেয়ার মূল্য দ্বারা সীমিত দায় কোম্পানিকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়; যথা:

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।

- **প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি (Private Limited Company):** ন্যূনতম ২ জন এবং সর্বাধিক ৫০ জন সদস্যের সমন্বয়ে সীমাবদ্ধ দায়ের ভিত্তিতে যে কোম্পানি গঠিত হয় তাকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পাানি বলে। এরূপ কোম্পানি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয়ের আমন্ত্রণ জানাতে পারে না এবং এর শেয়ারগুলো অবাধে হস্তান্তরযোগ্য নয়। সাধারণত পরস্পরের পরিচিত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এ ধরনের কোম্পানি গঠিত হয়ে থাকে।

- **পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি (Public Limited Company):** কমপক্ষে ৭ জন এবং সর্বোচ্চ শেয়ারের দ্বারা সীমিত যে-কোনো সংখ্যক সদস্য নিয়ে যে কোম্পানি গঠিত হয়ে থাকে, তাকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি জনসাধারণের নিকট শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়ের আমন্ত্রণ জানাতে পারে এবং এর শেয়ারগুলো অবাধে হস্তান্তর করতে পারে।

মালিকানার প্রকৃতির ভিত্তিতে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে আবার নিম্নোক্ত বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়-

- **সরকারি কোম্পানি (Government Company):** যে সীমিত দায় কোম্পানির সকল শেয়ার অথবা অন্তত ৫১% শেয়ারের মালিকানা সরকারের হাতে থাকে তাকে সরকারি কোম্পানি বলে। অর্থাৎ এরূপ কোম্পানির সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যক শেয়ারের মালিক থাকে সরকার। এ কারণে কোম্পানির পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সরকারের হাতেই থাকে। সাধারণত সরকার জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ জনকল্যাণমূলক ও আর্থিক ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসায়ের দায়িত্ব নিয়ে থাকে।

- **বেসরকারি কোম্পানি (Non-government Company):** যে সীমিত দায় কোম্পানির সকল শেয়ারে মধ্যে অধিকাংশ শেয়ারের মালিকানা জনসাধারণের হাতে থাকে তাকে বেসরকারি কোম্পানি বলে। সাধারণ জনগণই এ জাতীয় কোম্পানির প্রবর্তক, মালিক ও পরিচালক। সরকারি কোম্পানি ছাড়া সকল প্রাইভেট ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বেসরকারি কোম্পানি হিসাবে পরিগণিত হয়।

- **হোল্ডিং কোম্পানি (Holding Company):** যে কোম্পানি অন্য কোনো এক বা একাধিক কোম্পানির সকল অথবা অধিকাংশ (৫০% এর অধিক) শেয়ার ক্রয় করে তার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করে তাকে হোল্ডিং কোম্পানি বা ধারক কোম্পানি বলে। কোম্পানি আইনের ২ (২) ধারায় বলা হয়েছে যে, 'যদি কোনো কোম্পানি অপর কোনো কোম্পানি বা কোম্পানিসমূহের ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের অর্ধেকের বেশি ধারণ করে অথবা ভোটদান ক্ষমতার অর্ধেকের বেশি প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করে অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিচালক নিয়োগে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় তবে ঐ কোম্পানিকে হোল্ডিং কোম্পানি বলা যাবে।

- **অধীন বা সাবসিডিয়ারি কোম্পানি (Subsidiary Company):** সাবসিডিয়ারি হলো সেই কোম্পানি যে কোম্পানির অধিকাংশ শেয়ার মালিকানা, ভোটদান ক্ষমতা, কোম্পানির পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অন্য কোনো কোম্পানির অধীনে থাকে তাকে সাবসিডিয়ারি কোম্পানি বলে। কোম্পানি আইনের ২ (২) ধারা অনুসারে, 'যদি কোনো কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের নামিক মূল্যের অর্ধেকের বেশি অথবা ভোটদান ক্ষমতার অর্ধেকের বেশি অপর কোনো কোম্পানি অধিকারে অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিচালক নিয়োগের ক্ষমতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপর কোনো কোম্পানির অধীনে ন্যস্ত থাকে তবে এরূপ কোম্পানিকে সাবসিডিয়ারি বা অধীনস্থ কোম্পানি বলে।

খ. সীমাহীন দায় কোম্পানি (Unlimited Liability Company): যে নিবন্ধিত কোম্পানির সদস্য বা শেয়ার হোল্ডারদের দায় সীমাহীন তাকে সীমাহীন দায় কোম্পানি বলে। কোম্পানি আইনের ৫ (গ) ধারায় বলা হয়েছে যে, 'অসীম দায় কোম্পানি এমন কোম্পানি যার সদস্যগণের দায়ের কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা থাকে না। অর্থাৎ কোম্পানি আইনের আওতায় গঠিত ও নিবন্ধিত হওয়া সত্ত্বেও কোম্পানির সদস্যগণ ব্যবসায়ের দেনা মেটাতে একক অথবা যৌথভাবে দায়ী থাকে।

৪. অনিবন্ধিত কোম্পানি (Un-registed Company): ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী 'অনিবন্ধনকৃত কোম্পানি' বলতে এ আইন প্রবর্তনের পূর্বে বলবৎ কোম্পানিসংক্রান্ত কোনো আইন অথবা এ আইনের অধীনে নিবন্ধীকৃত কোনো কোম্পানি অন্তর্ভুক্ত হবে না, তবে ৭ এর অধিক সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কোনো অংশীদারি ব্যবসায় বা সমিতি বা কোম্পানি 'অনিবন্ধিত কোম্পানি' বলে গণ্য হবে, যদি তা উক্ত আইনগুলোর কোনোটির অধীনেই নিবন্ধনকৃত না হয়ে থাকে।

৫. অন্যান্য কোম্পানি (Other Company): উপর্যুক্ত কোম্পানিসমূহ ছাড়াও আরও কয়েক ধরনের কোম্পানির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। নীচে এদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

- **বিদ্যমান কোম্পানি (Existing Company):** ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন ২-১ (ঢ) ধারা অনুযায়ী বিদ্যমান কোম্পানি বলতে এ আইন প্রবর্তনের পূর্বে যে-কোনো সময়ে বলবৎ কোম্পানি সংক্রান্ত কোনো আইনের অধীনে গঠিত ও নিবন্ধনকৃত এমন কোম্পানিকে বুঝাবে, যা উক্ত আইন প্রবর্তনের পরেও বিদ্যমান কোম্পানি আইনের আওতায় কোনো কোম্পানি গঠিত ও নিবন্ধিত হয়ে বর্তমানেও চালু হয়ে থাকলে তাকে বিদ্যমান কোম্পানি বলা হয়।

- **বিদেশী কোম্পানি (Foreign Company):** বাংলাদেশে প্রবর্তিত ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন ৩৮৭ ধারা অনুযায়ী কোনো কোম্পানি দেশের বাইরে গঠিত ও নিবন্ধিত হয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ব্যবসায়স্থল প্রতিষ্ঠা করার নিমিত্তে কোম্পানিসংক্রান্ত বিভিন্ন দলিলপত্র পুনরায় এদেশের কোম্পানিসমূহের নিবন্ধকের নিকট দাখিল করে নিবন্ধন লাভ করলে তাকে বিদেশি কোম্পানি বলে। 'আমেরিকান লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি:' (মেটলাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি) এরূপ একটি বিদেশি কোম্পানির উদাহরণ।

- **অব্যবসায়ী বা লাভহীন কোম্পানি (Non-trading or Non-profit Company):** যে কোম্পানি অর্জিত মুনাফা সদস্যদের মধ্যে বণ্টন না করে এর উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে ব্যয় করে তাকে অব্যবসায়ী বা লাভহীন কোম্পানি হিসাবে বলে। সাধারণত শিল্পকলা, বিজ্ঞান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তথা বিবিধ সামাজিক কার্যক্রমের উন্নয়নের জন্যে এরূপ কোম্পানি গঠিত হয়ে থাকে।

- **বিশেষ কোম্পানি (Special Company):** যে সকল কোম্পানি দেশের প্রচলিত কোম্পানি আইনের অধীনে নিবন্ধিত হলেও অন্য কোনো বিশেষ আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় এদেরকে বিশেষ কোম্পানি অভিহিত করা হয়। বাংলাদেশের বিমা কোম্পানি এবং ব্যাংকিং কোম্পানিগুলোকে বিশেষ কোম্পানির উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব কোম্পানি এদের সংশ্লিষ্ট আইন দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হলেও কোম্পানি আইনের অধীনে নিবন্ধিত।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি

Private Limited Company

ন্যূনতম ২ জন এবং সর্বাধিক ৫০ জন সদস্য নিয়ে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ দায়ের ভিত্তিতে যে কোম্পানি গঠিত এবং যার শেয়ার অবাধে হস্তান্তর করা যায় না তাকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলে। ১৯৯৪ সালে কোম্পানি আইনের ২ (১) (ট) ধারায় বলা হয়েছে যে, 'প্রাইভেট কোম্পানি' বলতে এমন কোম্পানিকে বোঝায় যা এর স্মারকলিপি দ্বারা-

ক. শেয়ার হস্তান্তরে বিধিনিষেধ আরোপ করে;
খ. শেয়ার বা ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে জনসাধারণের প্রতি আমন্ত্রণ জানাতে নিষিদ্ধ করে; এবং
গ. এর সদস্য সংখ্যা ৫০ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে।

সুতরাং যে কোম্পানির সদস্য সংখ্যা কমপক্ষে ২ জন এবং সর্বাধিক ৫০ জনের অধিক নয়, সদস্যগণের শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য নয় এবং জনগণের উদ্দেশ্যে শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়ের আহ্বান জানাতে পারে না তাকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলা হয়। এ ধরনের সদস্যগণ সাধারণত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং এরাই কোম্পানি মূলধনের যোগান দেয়। কোম্পানি আইন অনুযায়ী এটি কৃত্রিম ব্যক্তি সত্ত্বার অধিকারী এবং এর শেয়ারহোল্ডারদের দায় ক্রীত শেয়ারের মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। কোম্পানির নিবন্ধকের নিকট হতে নিবন্ধনপত্র বা Certificate of Incorporation প্রাপ্তির পরপরই প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ব্যবসায় শুরু করতে পারে, সেজন্যে তাকে নিবন্ধকের নিকট কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র বা Certificate of Commencement সংগ্রহ করতে হয় না।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি

Public Limited Company

কমপক্ষে ৭ জন এবং সর্বাধিক শেয়ারের সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ যে-কোনো সংখ্যক সদস্যদের নিয়ে সীমাবদ্ধ দায়ের ভিত্তিতে শেয়ার হস্তান্তরের অধিকার নিয়ে কৃত্রিম সত্তাবিশিষ্ট যে যৌথ মূলধনি ব্যবসায় গঠন করে তাকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলে। কোম্পানি আইন অনুযায়ী প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ব্যতীত সকল কোম্পানিই পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে পরিগণিত। বাংলাদেশে প্রবর্তিত ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন ২ (১) (:) ধারায় বলা হয়েছে, 'পাবলিক কোম্পানি বলতে এ আইন বা এ আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ কোনো আইনের অধীনে নিবন্ধিত (Incorporated) এমন কোনো কোম্পানিকে বুঝাবে যা প্রাইভেট কোম্পানি নয়।'

সাধারণ দৃষ্টিতে কোম্পানি বলতে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে বুঝে থাকি। এরূপ কোম্পানির মূলধন কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শেয়ারে বিভক্ত এবং শেয়ারগুলো অবাধে হস্তান্তরযোগ্য। যে-কোনো লোক এক বা একাধিক শেয়ার ক্রয় করে এর সদস্য বা মালিক হতে পারে। এটি জনসাধারণ শেয়ার ও ঋণপত্র ক্রয়ের আমন্ত্রণ জানাতে পারে। এরূপ কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারদের দায় তাদের ক্রীত শেয়ারের মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। এর মালিকানা থেকে ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ আলাদা। শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা নির্বাচিত পরিচালক পরিষদ দ্বারা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি পরিচালিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ এক মালিকানা, যৌথ মালিকানা, যৌথ পরিবার ও অংশীদারি ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে খাতায় লিখুন এবং কোম্পানির ধরনসমূহ আলোচনাপূর্বক অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করবেন।

সারসংক্ষেপ

এক মালিকানা ব্যবসায়ের গঠন ও এর পরিচালনা একই সূত্রে গ্রথিত। কারণ, মালিককেই এর সমুদয় কার্যাবলি সম্পাদন করতে হয়। প্রয়োজনীয় অর্থ ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ থেকে শুরু করে এ গুলোর সঠিক প্রয়োগের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ তাকেই গ্রহণ করতে হয়। ব্যবসায়ের পরিসর একটু বড় হলে দু-চারজন লোকবলের প্রয়োজন হলে তিনি উপযুক্ত কর্মী বাছাই করে নাই। এ ছাড়াও ব্যবসায়ের কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কর্মীদেরকে উৎসাহ প্রদান, বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত নির্দেশ দান ও নিয়ন্ত্রণের জন্য তাকেই সকল কাজ সম্পাদান করতে হয়। পারিবারিক ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পরিবারের সদস্যদের উপর থাকে। সাধারণতঃ পরিবারের কর্তা ব্যক্তিই প্রতিষ্ঠান প্রদান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। পরিবারের বাহিরের লোকদের হাতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়ার নজির খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। বাঙালি মুসলমানদের পারিবারিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তথা পারিবারিক ব্যবস্থাপনার প্রচলন পূর্বেও খুব একটা ছিল না, এখনও নাই। তবে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে দেখা যায় যে, অবাঙালি ব্যবসায়ীগণ ব্যবসায় পরিচালনার দায়িত্ব নিজেরাই পালন করত। পরিবারের মধ্যে ব্যবসায় পরিচালনার যোগ্য লোক পাওয়া না গেলে তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত কোনো লোককে এ দায়িত্ব দেওয়া হতো। অংশীদারি ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সাধারণতঃ অংশীদারগণই পালন করে থাকে। অর্থাৎ, তারা সকলে মিলে অথবা সকলের মধ্য থেকে একজনকে ব্যবস্থাপক নিয়োগ করা হয়, যার উপর ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। তিনি তার কাজের জন্য সকল অংশীদারদের নিকট দায়ী থাকেন। তাকে মাসিক নির্দিষ্ট হারে বেতন প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, তাকে অত্যন্ত দক্ষ ও বিচক্ষণ হতে হয়। কারণ, দক্ষ পরিচালনার উপরই ব্যবসায়ের সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে। যৌথ মূলধনি কোম্পানি কেবল একটি মুনাফা অর্জনকারী ব্যবসায় সংগঠনই নয়; কোম্পানি সংগঠন একটি কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তাবিশিষ্ট কোম্পানি, আইন সৃষ্ট ব্যবসায় সংগঠন। নীচে কোম্পানি সংগঠনের কতিপয় সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো- ১৯৯৪ সালের বাংলাদেশের বলবৎযোগ্য কোম্পানি আইনের ২ (১) (ঘ) ধারায় বলা হয়েছে যে, 'কোম্পানি বলতে কোম্পানি আইনের আওতায় গঠিত ও নিবন্ধিত অথবা কোনো বিদ্যমান কোম্পানিকে বোঝায়।' বিচারপতি জন মার্শাল- এর মতে, 'কোম্পানি হলো এমন একটি কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা যা অদৃশ্য স্পর্শাতীত তবে আইনের মাঝে বিদ্যমান।' কোম্পানির গঠন, প্রকৃতি, দায়, মালিকানা ইত্যাদির ভিত্তিতে যৌথ মূলধনি কোম্পানিকে প্রথমত পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়: ১. সনদপ্রাপ্ত কোম্পানি ২. সংবিধিবদ্ধ কোম্পানি ৩. নিবন্ধিত কোম্পানি ৪. অনিবন্ধিত কোম্পানি ৫. অন্যান্যা কোম্পানি। নিবন্ধিত কোম্পানিকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন: সীমিত দায়ের কোম্পানি এবং সীমাহীন দায়ের কোম্পানি। আবার সীমিত দায়ের কোম্পানিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন: প্রতিশ্রুতি দ্বারা সীমিত দায় কোম্পানি এবং শেয়ার দ্বারা সীমিত দায় কোম্পানি। আবার শেয়ার দ্বারা সীমিত দায় কোম্পানিকে ২ ভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন: প্রাইভেট কোম্পানি এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। আবার পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ৪ ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন: সরকারি কোম্পানি, বেসরকারি কোম্পানি, হোল্ডিং কোম্পানি এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানি। অন্যদিকে উল্লেখিত কোম্পানির বাইরে অন্যান্য কোম্পানিকে ৪ ভাগে বিভক্ত করা যায়; যেমন: বিদ্যমান কোম্পানি, বিদেশি ব্যবসায়ী, অব্যবসায়ী কোম্পানি ও বিশেষ কোম্পানি।

পাঠ-৫.২ পরিচালকের যোগ্যতা; পরিচালক নিয়োগ; পরিচালকের অপসারণ; পরিচালক পরিষদের কার্যাবলি; পরিচালকের ক্ষমতা; পরিচালকের দায়িত্ব

Qualification of Director; Appointment of Director; Removal of Director; Functions of Board of Director; Power of Director; Liabilities of Director

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরিচালকের যোগ্যতা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- পরিচালক নিয়োগ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- পরিচালকের অপসারণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- পরিচালক পরিষদের কার্যাবলি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন;
- পরিচালকের ক্ষমতা ও পরিচালকের দায়িত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

পরিচালকের যোগ্যতা

Qualification of Director

কোম্পানি আইনে পরিচালক হবার জন্যে কী কী যোগ্যতা থাকতে হবে এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু উল্লেখ না থাকলেও বাংলাদেশে প্রবর্তিত ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ৯২ ধারার বর্ণনা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি পরিচালক হিসাবে গণ্য হবে না, যদি কোম্পানি সংঘ বিধিতে উল্লিখিত পরিচালকদের যোগ্যতাসূচক শেয়ার না ক্রয় করা থাকে। তবে কোম্পাানি আইনে বিস্তারিত কিছু উল্লেখ না থাকলেও সাধারণভাবে কোম্পানির পরিচালক হওয়ার জন্যে নিম্নোক্ত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক-

১. পরিচালকদের যোগ্যতা অর্জনের জন্যে ন্যূনতম সংখ্যক শেয়ার ক্রয় করতে হবে। এ সম্পর্কে কোম্পানি আইন ৯৭ (১) ধারায় বলা হয়েছে যে, 'কোম্পানির সংঘবিধিতে নির্দিষ্ট যোগ্যতাসূচক শেয়ারের ধারণ প্রত্যেক পরিচালকের জন্য বাধ্যতামূলক হবে এবং যদি তিনি পরিচালক নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে উক্ত যোগ্যতা অর্জন না করে থাকেন তবে তিনি তার নিযুক্তির ষাট দিন অথবা সংঘ বিধি দ্বারা নির্দিষ্টকৃত তদপেক্ষা কম সময়ের মধ্যে তার যোগ্যতাসূচক শেয়ার গ্রহণ করবেন।
২. পরিচালককে সুস্থ ও সবল হতে হবে।
৩. তাকে সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হতে হবে।
৪. সাবালক হতে হবে।
৫. আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকতে হবে।
৬. দেউলিয়া হলে বা দেউলিয়াত্বের জন্যে আবেদন করে থাকলে সে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।
৭. তাকে ঋণ পরিশোধে সক্ষম হতে হবে।
৮. সর্বোপরি পরিচালককে কোম্পানির শেয়ার মালিক হতে হবে।

উপর্যুক্ত যোগ্যতা ও গুণাবলি থাকলে যে-কোনো ব্যক্তি যৌথ মূলধনি কোম্পানির পরিচালক নিযুক্ত হতে পারবে। তবে পরিমেল নিয়মাবলিতে যোগ্যতার আরও কোনো শর্ত জুড়ে দিলে তাও পূরণ করতে হবে।

পরিচালক নিয়োগ

Appointment of Director

১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ৯১ ধারায় যৌথ মূলধনি কোম্পানির পরিচালক নিয়োগ বিধিতে বলা হয়েছে যে, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে অন্তত তিনজন এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে অন্তত দুইজন পরিচালক থাকবেন। নীচে পরিচালক নিয়োগের পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো:

১. **প্রবর্তকের দ্বারা নিযুক্তি (Appointment by Enterpreneurs):** কোম্পানির প্রথম পরিচালকবৃন্দ প্রবর্তকের দ্বারা নির্বাচিত হন। কোম্পানির সংঘ বিধি বা পরিমেল নিয়মাবলিতে যেসব ব্যক্তির নাম পরিচালক হিসাবে উল্লিখিত থাকে

তারাই কোম্পানির প্রথম পরিচালক হয়ে থাকেন। সংঘ বিধিতে যদি পরিচালক হিসাবে কারও নাম উল্লেখ না থাকে তাহলে যারা সংঘস্মারকে স্বাক্ষর করেন তারাই প্রথম পরিচালক হিসাবে গণ্য হন। কোম্পানি আইনের ৯১ (১) (ক) ধারায় বলা হয়েছে যে, 'যতদিন পর্যন্ত প্রথম পরিচালক নিযুক্ত না হবেন ততদিন পর্যন্ত সংঘস্মারকে স্বাক্ষরদানকারীগণ কোম্পানির পরিচালক হিসাবে গণ্য হবেন।

২. **শেয়ারমালিকদের দ্বারা নিযুক্তি (Appointment by Shareholders):** কোম্পানি আইনের ৯১ (১) (খ) ধারায় বলা হয়েছে যে, 'কোম্প্যানির পরিচালকগণ এর সাধারণ সভায় কোম্পানির সদস্যগণ কর্তৃক তাদের মধ্য হতে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন।

৩. **পরিচালক পরিষদ দ্বারা নিয়োগ (Appointment by Board of Directors):** কোম্পানি আইনের ৯১ (১) (গ) ধারায় বলা হয়েছে যে, সাময়িক কোনো পরিচালকের পদ শূন্য হলে তা অন্যান্য পরিচালকগণ থেকে সেই পরিচালকের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্যে নিয়োজিত হবেন এবং সে অনুযায়ী অবসরগ্রহণ করবেন। অর্থাৎ, পূর্বতন পরিচালক শেষ যে তারিখে নিযুক্ত হয়েছিলেন সেই একই তারিখে তিনি অর্থাৎ, বর্তমান পরিচালক নিযুক্ত হয়েছিলেন বলে গণ্য হবেন এবং তিনি সে মোতাবেক অবসরগ্রহণ করবেন। পরিচালকের শূন্য পদে নিযুক্ত তার পূর্বতন ব্যক্তি যতদিন পরিচালক থাকতে পারতেন কেবল সে সময়টুকুর জন্যে পরিচালক হিসাবে বহাল থাকবেন।

৪. **ব্যবস্থাপক প্রতিনিধি দ্বারা নিযুক্তি (Appointment by Managing Agent):** কোম্পানি আইনের ১২৫ ধারার বিধান অনুযায়ী পরিমেল নিয়মাবলিতে ক্ষমতা দেওয়া থাকলে ব্যবস্থাপক প্রতিনিধিরাও পরিচালক নিযুক্ত করতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে তাদের দ্বারা নির্বাচিত পরিচালকের সংখ্যা কোম্পানির মোট পরিচালকের সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের অধিক হতে পারে না।

৫. **সরকার কর্তৃক নিয়োগ (Appointment by Govt.):** কোম্পানির শেয়ারমালিকদের আবেদনক্রমে সরকার যে কোনো সময় কোম্পানির জন্যে এক বা একাধিক পরিচালক নিয়োগ করতে পারেন। কোম্পানি আইনে সরকারের পরিচালক নিয়োগের এ ক্ষমতা সংরক্ষিত রয়েছে।

পরিচালকদের অপসারণ

Removal of Director

সাধারণত যেসকল কারণে একজন পরিচালক পদ থেকে অপসারিত হয়ে থাকে সেগুলো নিম্নরূপঃ

১. **শেয়ার মালিকদের দ্বারা অপসারণ (Removal by Shareholders):** ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ১০৬ (১) ধারা অনুযায়ী কোম্পানির শেয়ারমালিকগণ সাধারণ সভায় বিশেষ প্রস্তাব পাস করে পরিচালকদের কার্যকাল শেষ হওয়ার পূর্বেই তাকে অপসারণ করতে পারেন এবং উক্ত সিদ্ধান্তে নতুন পরিচালক নিয়োগও করা যেতে পারে।

২. **বাধ্যতামূলক অপসারণ (Compulsory Removal):** কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারার বিধান অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত কারণে পরিচালকের বাধ্যতামূলক অপসারণ ঘটে-

ক. পরিচালক নিযুক্ত হওয়ার পর দুই মাসের মধ্যে যোগ্যতাসূচক শেয়ার ক্রয় না করলে;
খ. কোনো পরিচালকের মস্তিষ্ক বিকৃত হলে বা উন্মাদ হলে;
গ. আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হলে;
ঘ. দেউলিয়া বলে ঘোষিত হওয়ার জন্যে কোনো পরিচালকের আবেদনপত্র আদালতের বিবেচনাধীন থাকলে;
ঙ. নৈতিক অপরাধের জন্যে কোনো পরিচালক আদালত কর্তৃত ছয় মাস বা ততোধিক সময়ের জন্যে সাজাপ্রাপ্ত হলে;
চ. পরিচালক পরিষদের অনুমতি ব্যতীত পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে;
ছ. পরিচালক পরিষদের অনুমতি ব্যতীত তিনমাস পর্যন্ত যাবতীয় কাজেকর্মে অনুপস্থিত থাকলে;
জ. পরিচালকের কাজকর্ম দ্বারা জনসাধারণের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে বলে আদালত মনে করলে।

৩. **সরকার কর্তৃক অপসারণ (Removal by the Government):** সরকারও কোম্পানির পরিচালককে অপসারণ করতে পারে। সাধারণত নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে সরকার পরিচালকদের অপসারণ করতে পারেন-

ক. যখন কোনো পরিচালক আইনগত বাধ্যবাধকতাকে অবহেলা করেন কিংবা বিশ্বাস ভঙ্গের দায়ে দায়ী হন কিংবা কোনোরূপ প্রতারণামূলক কাজের জন্যে অপরাধী বলে বিবেচিত হন।

খ. যখন কোম্পানির ব্যবসায় কার্যক্রম প্রকৃত ব্যবসায় নীতি অনুযায়ী পরিচালিত না হয়।

গ. যখন কোম্পানির পরিচালকদের দ্বারা এর ব্যবসায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ঘ. যখন কোম্পানির পরিচালক পরিষদের সদস্য কিংবা পাওনাদার কিংবা জনসাধারণের স্বার্থ পরিপন্থী কোনো প্রতারণামূলক কিংবা অবৈধ দিকে কোম্পানিকে পরিচালিত করে।

উপর্যুক্ত কারণসমূহের প্রেক্ষিতে উচ্চ আদালতের সুপারিশক্রমে সরকার কোম্পানির পরিচালকের এরূপ অপসারণ কার্যকরি করে থাকে।

পরিচালক পরিষদ বা পরিচালকমণ্ডলীর কার্যাবলি

Functions of Board of Director

যৌথমূলধনি কোম্পানির পরিমেল নিয়মাবলিতে কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর কার্যসীমা নির্ধারিত থাকে। পরিচালকমণ্ডলী সাধারণত যে কাজগুলো সম্পাদন করে থাকে তা নিম্নরূপ-

১. **অর্থ ও সম্পত্তির তত্ত্বাবধান (Supervision of Money and Assets):** কোম্পানির প্রতিনিধি এবং অছি হিসাবে যারা কাজ করে থাকে তাদের হাতে কোম্পানির যাবতীয় অর্থ ও সম্পত্তির দেখাশুনার ভার ন্যস্ত থাকে।

২. **নীতি নির্ধারণ (Policy Determination):** তারা কোম্পানির ব্যবসায় সংক্রান্ত যাবতীয় নীতি নির্ধারণ করে থাকেন।

৩. **চুক্তি সম্পাদন (Formation of Contract):** কোম্পানির হয়ে তারা তৃতীয় পক্ষের সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে পারেন।

৪. **হিসাবপত্র সংরক্ষণ (Preservation of Accounts):** তারা কোম্পানির হিসাবপত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

৫. **কর্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্ত (Appointment and Suspension of Employees):** পরিচালকমণ্ডলী প্রয়োজনবোধে কোম্পানির কর্মচারীদের নিয়োগ, বরখাস্ত সংক্রান্ত কার্যাবলিও সম্পাদন করে থাকেন।

৬. **সভাসংক্রান্ত কাজ (Meeting Related Work):** তারা কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের সভা আহ্বান ও বার্ষিক সাধারণ সভায় কোম্পানির লাভ-লোকসানের বিবৃতি, উদ্ধৃত্তপত্র এবং পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন পেশ করেন।

৭. **শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বন্টন (Distribution of Share & Debenture):** পরিচালকমণ্ডলী আবেদনকারীদের মধ্যে কোম্পানির শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বণ্টনের ব্যবস্থা করেন।

৮. **শেয়ার মূল্য তলব (Calling Share Value):** তারা শেয়ারের মূল্য আদায়ের জন্যে তলব প্রদান করেন।

৯. **মূলধন সংগ্রহ ও বিনিয়োগ (Collection of Capital & Investment):** পরিচালকমণ্ডলী কোম্পানিতে মূলধন বিনিয়োগ ও প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন।

১০. **লভ্যাংশ ঘোষণা ও বণ্টন (Dividend Announcement & Distribution):** শেয়ারহোল্ডারদের বার্ষিক সাধারণ সভায় লভ্যাংশ ঘোষণা ও বণ্টনের দায়িত্ব পালন করেন।

১১. **সমর্পিত শেয়ার গ্রহণ (Taking Surrender Share):** কোনো শেয়ারহোল্ডারগণ তাদের শেয়ারগুলো সমর্পণ করতে চাইলে পরিচালকমণ্ডলী তা গ্রহণের ব্যবস্থা করেন।

১২. **পরিচালকের শূন্যপদ পূরণ (Fill up the Vacant Post of Director):** কোম্পানিতে কোনো পরিচালকের পদ শূন্য হলে তারা পূরণের ব্যবস্থা করেন।

১৩. **হিসাবরক্ষকের শূন্যপদ পূরণ (Fill up the Vacant Post of Accountant):** সাময়িকভাবে কোম্পানির হিসাবরক্ষকের পদ শূন্য হলে তা তারা পূরণ করেন।

১৪. **রিজার্ভের ব্যবস্থা (System of Reserve):** পরিচালকমণ্ডলী কোম্পানির কিছু অংশ রিজার্ভ রাখতে পারেন।

১৫. **কর্মসূচি ও বাজেট অনুমোদন (Approval of Workschedule and Budget):** কোম্পানির নির্বাহীগণ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বাজেট ও কর্মসূচি পরিচালকমণ্ডলী অনুমোদন করেন।

১৬. **ঋণপত্র প্রচার (Publicity of Debenture):** পরিচালকমণ্ডলী কোম্পানির প্রয়োজনে মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাজারে ঋণপত্র প্রচারসংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকেন।

১৭. **শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ সংরক্ষণ (Maintain of Shareholder Interest):** পরিমেল নিয়মাবলির শর্তাধীনে থেকে তারা কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থের অনুকূলে সকল কাজ করে থাকেন।

১৮. **ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি নিয়োগ (Appointment of Managing Agent):** কোম্পানির প্রয়োজনে পরিচালকমণ্ডলী ব্যবস্থাপক প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যবস্থা করেন।

১৯. **ফলাফল মূল্যায়ন (Result Evaluation):** পরিচালকমণ্ডলীর আর একটি অন্যতম কাজ হলো কোম্পানির নীতি, উদ্দেশ্য ও আদর্শের সাথে সঙ্গতি রেখে কোম্পানির সম্পাদিত কার্যাবলির যথাযথ মূল্যায়ন করা।

২০. **ব্যবসায় পরিচালনা ও সম্প্রসারণ (Operating Business and Expansion):** পরিচালকমণ্ডলী পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবসায় পরিচালনা ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করেন।

উপর্যুক্ত কাজগুলো ছাড়াও পরিচালকমণ্ডলী কোম্পানির সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার দিকে লক্ষ্য রেখে আর্থ-সামাজিক পরিবেশের আলোকে বিবিধ কার্যসম্পাদন করে থাকেন।

পরিচালকদের ক্ষমতা

Power of Director

কোম্পানির পরিমেল নিয়মাবলিতে কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর ক্ষমতার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে। তবে কোনো কোম্পানির নিজস্ব পরিমেল নিয়মাবলি না থাকলে সে ক্ষেত্রে ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে প্রদত্ত 'তফসিল-১' এ বর্ণিত কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে স্পষ্টতার অভাব দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে পরিচালক পরিষদের সাধারণ সভার মাধ্যমে পরিচালকদের উক্ত কার্যসম্পাদনের জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

নীচে কোম্পানির পরিচালকদের ক্ষমতার বর্ণনা দেওয়া হলো

১. কোম্পানি পরিচালনাসংক্রান্ত সাধারণ নীতি নির্ধারণ ও প্রণয়ন;
২. ব্যবস্থাপক পরিচালক নিয়োগ;
৩. পরিচালনা পরিষদের সভাপতি নির্বাচন;
৪. কোম্পানির পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
৫. কোম্পানির পক্ষে চুক্তি সম্পাদন;
৬. কোম্পানির আইন অনুযায়ী বিধিবদ্ধ সভা আহ্বান করা;
৭. শেয়ারহোল্ডারদের বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করা;
৮. কোম্পানি আইন অনুযায়ী শেয়ার হোল্ডারদের জরুরি সাধারণ সভা আহ্বান;
৯. কোম্পানির শেয়ারসমূহ বিলির উদ্দেশ্যে প্রচার করা;
১০. শেয়ার ইস্যু এবং শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন করা;
১১. শেয়ার বাবদ অর্থ তলব ও গ্রহণ;
১২. শেয়ার বাতিল ও বাজেয়াপ্তকরণ;
১৩. শেয়ারহোল্ডারদের জন্যে লভ্যাংশ অনুমোদন করা;
১৪. ঋণপত্র প্রচার করা;
১৫. ঋণপত্র বাবদ অর্থ গ্রহণ করা;
১৬. কোম্পানির পুঁজি বিনিয়োগ করা;
১৭. কোম্পানির জন্যে ঋণ গ্রহণ করা;
১৮. কোম্পানির বাজেট অনুমোদন করা;
১৯. পরিচালকদের শূন্য পদে নতুন পরিচালক নিয়োগ করা;
২০. কোম্পানির মুনাফার অংশবিশেষ রিজার্ভ তহবিলে স্থানান্তর করা;
২১. কোম্পানির হিসাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করা;
২২. ব্যবসায়ের অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ অংশ বিক্রয়, হস্তান্তর বা ইজারা দেওয়া।

উল্লিখিত ক্ষমতাসমূহের অংশবিশেষ পরিচালকগণ ইচ্ছা করলে সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধির উপর ন্যস্ত করতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রেও উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হবেন।

পরিচালকদের দায়িত্ব

Liabilities of Director

কোনো পরিচালক যতক্ষণ পর্যন্ত না তার নির্ধারিত ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা যায় না। কোম্পানিতে পরিচালকদের দায়-দায়িত্বগুলো নিম্নরূপঃ

১. সাধারণত শেয়ারহোল্ডারদের মতো পরিচালকদের দায়ও তাদের ক্রীত শেয়ারের মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ।

২. কোম্পানি আইন ও সংঘবিধিতে প্রদত্ত ক্ষমতা বহির্ভূত কোনোরূপ চুক্তি কিংবা কার্যসম্পাদনের জন্যে পরিচালকরা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

৩. কোম্পানির সংঘস্মারকের আওতা বহির্ভূত কোনো কাজে কোম্পানির অর্থ ব্যবহার করলে তার জন্যে পরিচালকগণ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন।

৪. কোম্পানির কাজে পরিচালকদের কোনোরূপ অবহেলার জন্যে কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হলে পরিচালকগণ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন।

৫. কোম্পানির প্রসপেক্টাস বা বিবরণপত্রে কোনোরূপ অসত্য ও ভুয়া বিবৃতি প্রদান করলে তজ্জন্য পরিচালকগণ দায়ী হবেন।

৬. কোম্পানির সিলমোহর ব্যতীত কোনো বাণিজ্যিক হুন্ডি বা বিনিময় বিলে যদি পরিচালকগণ স্বাক্ষর প্রদান করেন তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত দায় জন্মাবে।

৭. কোনো পরিচালক ব্যবসায় থেকে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জন করলে তা কোম্পানিকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন।

৮. পরিচালকগণ কোম্পানির তহবিল বা সম্পত্তির জিম্মাদার হিসাবে বিশ্বাস ভঙ্গ করলে তাদের দায়ী করা যাবে।

৯. কোনো পরিচালক ব্যবসায় থেকে কোনো ঋণ গ্রহণ করলে তজ্জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন।

১০. পরিচালকগণ আইনত দন্ডনীয় অপরাধ, আইন ভঙ্গ ইত্যাদির কারণে ফৌজদারী দায়ে দণ্ডিত হবেন।

১১. কোম্পানির তহবিল তছরুপ, কোনো প্রকার ঘুষ গ্রহণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারজনিত অন্য যে কোনো প্রকার কাজের জন্য পরিচালকগণ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন।

১২. আইন দ্বারা নিষিদ্ধ কোনো কার্যে কোম্পানির তহবিল ব্যবহার করলে তজ্জন্য পরিচালকগণ দায়ী হবেন। যেমন: মূলধন হতে লভ্যাংশ প্রদান।

১৩. সর্বোপরি কোম্পানি আইনের বিধান পালনে পরিচালকগণ ব্যর্থ হলে এর জন্য দায়ী হবেন।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ পরিচালকের যোগ্যতা, নিয়োগ ও অপসারণ সম্পর্কে খাতায় লিখুন এবং পরিচালক পরিষদের কার্যাবলি, ক্ষমতা ও দায়িত্ব বর্ণনাকরণ এবং নিজেদের জ্ঞান যাচাই করে নিন।

সারসংক্ষেপ

কোম্পানি আইনে পরিচালক হবার জন্যে কী কী যোগ্যতা থাকতে হবে এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু উল্লেখ না থাকলেও বাংলাদেশে প্রবর্তিত ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ৯২ ধারার বর্ণনা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি পরিচালক হিসাবে গণ্য হবে না, যদি তার সংঘবিধিতে উল্লিখিত পরিচালকদের যোগ্যতা সূচক শেয়ার না ক্রয় করা থাকে। তবে কোম্পাানি আইনে বিস্তারিত কিছু উল্লেখ না থাকলেও সাধারণভাবে কোম্পানির পরিচালক হওয়ার জন্যে নিম্নোক্ত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক: ১. পরিচালকদের যোগ্যতা অর্জনের জন্যে ন্যূনতম সংখ্যক শেয়ার ক্রয় করতে হবে। ২. পরিচালককে সুস্থ ও সবল হতে হবে। ৩. তাকে সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হতে হবে। ৪. সাবালক হতে হবে। ৫. আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকতে হবে। ৬. দেউলিয়া হলে বা দেউলিয়াত্বের জন্যে আবেদন করে থাকলে সে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। ৭. তাকে ঋণ পরিশোধে সক্ষম হতে হবে। ৮. সর্বোপরি পরিচালককে কোম্পানির শেয়ার মালিক হতে হবে। ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ৯১ ধারায় যৌথ মূলধনি কোম্পানির পরিচালক নিয়োগ বিধিতে বলা হয়েছে যে, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে অন্তত তিনজন এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে অন্তত দুইজন পরিচালক থাকবেন। সাধারণত যেসকল কারণে একজন পরিচালক পদ থেকে অপসারিত হয়ে থাকে সেগুলো নিম্নরূপ- ১.শেয়ার মালিকদের দ্বারা অপসারণ: ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ১০৬ (১) ধারা অনুযায়ী কোম্পানির শেয়ার মালিকগণ সাধারণ সভায় বিশেষ প্রস্তাব পাস করে পরিচালকদের কার্যকাল শেষ হওয়ার পূর্বেই তাকে অপসারণ করতে পারেন এবং উক্ত সিদ্ধান্তে নতুন পরিচালক নিয়োগও করা যেতে পারে। ২. বাধ্যতামূলক অপসারণ: কোম্পানি ব্যবস্থাপনা ১০৮ ধারার বিধান অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত কারণে পরিচালকের বাধ্যতামূলক অপসারণ ঘটে- ক. পরিচালক নিযুক্ত হওয়ার পর দু'মাসের মধ্যে যোগ্যতাসূচক শেয়ার ক্রয় না করলে; খ.কোনো পরিচালকের মস্তিষ্ক বিকৃত হলে বা উন্মাদ হলে; গ.আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হলে; ঘ. দেউলিয়া বলে ঘোষিত হওয়ার জন্যে কোনো পরিচালকের আবেদনপত্র আদালতের বিবেচনাধীন থাকলে; ঙ. নৈতিক অপরাধের জন্যে কোনো পরিচালক আদালত কর্তৃত ছয় মাস বা ততোধিক সময়ের জন্যে সাজাপ্রাপ্ত হলে; চ.পরিচালক পরিষদের অনুমতি ব্যতীত পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে; ছ.পরিচালক পরিষদের অনুমতি ব্যতীত তিনমাস পর্যন্ত যাবতীয় কাজকর্ম অনুপস্থিত থাকলে; জ. পরিচালকের কাজকর্ম দ্বারা জনসাধারণের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে বলে আদালত মনে করলে। যৌথমূলধনি কোম্পানির পরিমেল নিয়মাবলিতে কোম্পানির পরিচালকমণ্ডুলীর কার্যসীমা নির্ধারিত থাকে। পরিচালকমণ্ডুলী সাধারণত যে কাজগুলো সম্পাদন করে থাকে তা নিম্নরূপ: ১. অর্থ ও সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ২. নীতি নির্ধারণ ৩. চুক্তি সম্পাদন ৪. হিসাবপত্র সংরক্ষণ ৫. কর্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্ত ৬. সভা সংক্রান্ত কাজ।

পাঠ-৫.৩

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যাবলি; পরিচালকের পদশূন্যতা; ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি কী; ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধির কার্য বা ভূমিকা; ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

Functions of Managing Director; Vacation of Office of Director; Managing Agent System; Role or Functions of Managing Agent; Advantages & Disadvantages of Managing Agent System

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যাবলি সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- পরিচালকের পদশূন্যতা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধির কার্য বা ভূমিকা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যাবলি

Functions of Managing Director

কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাধারণত নিম্নলিখিত কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকেন:

১. কোম্পানির প্রধান কার্যনির্বাহী হিসাবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক পরিষদ কর্তৃক গৃহীত নীতি-পদ্ধতি, সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন।

২. তিনি কোম্পানির অধস্তন কর্মচারীদের সকল কাজকর্মের সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ করেন।

৩. পরিচালক পরিষদের মুখপাত্র হিসাবে তিনি কোম্পানির কাজকর্ম কোম্পানি আইন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করেন।

৪. কোম্পানির প্রতিনিধি হিসাবে তাকে কোম্পানির যাবতীয় সম্পত্তি ও অর্থের সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করতে হয়।

৫. তিনি কোম্পানির বিভিন্ন কর্মচারীদের দায়দায়িত্বের সীমা নির্দেশ করে দেন।

৬. কোম্পানির দৈনন্দিন কাজকর্ম যেন নির্বিঘ্নে ও সাবলীল গতিতে চলতে পারে সে দিকেও তাকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়।

৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালককে সরকারি বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সুষ্ঠু যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়।

৮. ব্যবস্থাপনার উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্যে তিনি পরিচালনা পরিষদের নিকট সুপারিশ পেশ করে থাকেন।

৯. তিনি কোম্পানি কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, ছাঁটাই, বরখাস্ত ইত্যাদি কার্যসম্পাদন করে থাকেন।

১০. তাকে পরিচালনা পরিষদের নিকট ব্যবসায় সংক্রান্ত নানাবিধ তথ্য ও রিপোর্ট পেশ করতে হয়।

১১. তিনি কোম্পানির কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

১২. ব্যবস্থাপনা লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক বিভাগ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে সমন্বয়সাধনের ব্যবস্থা করেন।

১৩. তিনি ব্যবসায়ের পুঁজির সংস্থানকল্পে প্রয়োজনীয় ঋণের ব্যবস্থা করেন।

১৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক কোম্পানির মুখপাত্র হিসাবে বহির্বিশ্বের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করেন।

১৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যবসায়ের প্রয়োজনে যে-কোনো জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন।

এক কথায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক কোম্পানির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সংক্রান্ত সকল প্রকার কার্যসম্পাদন করে থাকেন।

পরিচালকের পদ শূন্যতা

Vacation of Office of Director

কোম্পানি আইনের ১৮ ধারায় বর্ণিত হয়েছে যে, কী কী কারণে পরিচালকের পদ শূন্য হতে পারে। নীচে তা উল্লেখ করা হলো-

১. **ধারা ১০৮ (১) ক :** কোম্পানি আইনের ৯৭ (১) ধারামতে কোনো পরিচালক নির্বাচিত হওয়ার ষাট দিনের মধ্যে যোগ্যতাসূচক শেয়ার ক্রয় না করলে কিংবা শেয়ার পরিত্যাগ করলে পরিচালকের পদ শূন্য হবে।
২. **ধারা ১০৮ (১) খ :** আদালত যদি কোনো পরিচালককে অপ্রকৃতিস্থ বলে স্থির করেন।
৩. **ধারা ১০৮ (১) গ :** কোনো পরিচালক আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হলে।
৪. **ধারা ১০৮ (১) ঘ :** তলব প্রদানের তারিখ হতে ৬ মাসের মধ্যে তার অধিকৃত শেয়ারগুলোর তলবের টাকা পরিশোধ না করলে তার পরিচালকত্ব লোপ পায়।
৫. **ধারা ১০৮ (১)ঙ :** কোম্পানির সাধারণ সভার অনুমোদন ব্যতীত কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত হলে উক্ত পরিচালকের পদ শূন্য হবে।
৬. **ধারা ১০৮ (১) চ :** পরিচালকমণ্ডলীর অনুমতি ব্যতীত পউপর তিনটি সভায় বা ধারাবাহিকভাবে তিনমাস ধরে পরিষদের সকল সভায় অনুপস্থিত থাকলে।
৭. **ধারা ১০৮ (১) ছ :** তিনি কোম্পানি আইনের ১০৩ ধারার বিধান অমান্য করে কোম্পানির নিকট ঋণ গ্রহণ করলে।
৮. **ধারা ১০৮ (১) জ :** কোনো চুক্তিতে ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত থাকা সত্ত্বেও তা প্রকাশ না করে তিনি যদি ১০৫ ধারায় বর্ণিত বিধান অমান্য করলে।

ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি পদ্ধতি

Managing Agent System

ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি হলো এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যারা যৌথ মূলধনি কোম্পানি পরিচালনা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীনে কোম্পানির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। সংশ্লিষ্ট কোম্পানির ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তারা পালন করে।

১৯৯৪ সালে কোম্পানি আইনে বলা হয়েছে যে, "কোনো ব্যক্তি, ফার্ম বা যৌথ মূলধনি কোম্পানি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে পরিচালক পরিষদের নিয়ন্ত্রণে ও তাদেরকে একটি যৌথ মূলধনি ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করলে তাকে ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি বলা হবে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন:

১. যে-কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি হতে পারবে;
২. কোম্পানির সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য চুক্তি করে তারা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করতে পারবে;
৩. তারা পরিচালকমণ্ডলীর অধীনে থেকেই ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে; এবং
৪. ব্যবস্থাপনা কার্যের বিনিময়ে তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ কমিশন বা আর্থিক সুবিধা পেয়ে থাকে।

সুতরাং বলা যায় যে, সে-ই সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিকে ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি বলা হয় যারা ব্যবস্থাপনা কাজে দক্ষ ও কোম্পানির সাথে চুক্তির বলে পরিচালকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে থেকে নির্দিষ্ট আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে থাকে।

ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধির ভূমিকা বা কার্য

Role or Functions of Managing Agent

কোনো দক্ষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধির কাজ করে থাকে। তারা সাধারণত কোম্পানি গঠন, মূলধন সংগ্রহ ও সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে থাকে। নীচে তাদের কার্যাবলি বা ভূমিকার আলোকপাত করা হলো:

১. **প্রবর্তকের কাজ (Functions of Promoter):** যারা কোম্পানি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে তাদেরকে উদ্যোক্তা বা প্রবর্তক বলে। ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিগণ উদ্যোক্তা বা বিনিয়োগকারীদের হয়ে কোম্পানি গঠনের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। এ জন্য তাদের এ কাজকে প্রবর্তকের কাজ বলা হয়। তারা কোম্পানি গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক কোম্পানি গঠন ও নিবন্ধনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে।

২. **মূলধন সংগ্রহের কাজ (Functions of Procuring Capital):** ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিগণ মূলধন সংগ্রহের কাজও করে থাকে। অর্থাৎ কোম্পানি গঠনের প্রাথমিক অবস্থায় প্রবর্তকগণ পর্যাপ্ত অর্থ সংস্থানে ব্যর্থ হলে ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিগণ প্রবর্তকদের হয়ে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেয়। তারা বিভিন্ন উপায়ে এ কাজটি করে, যেমন: নিজেদের কাছ থেকে অর্থ সরবরাহ করে, সহজশর্তে ঋণগ্রহণের ব্যবস্থা করে, ঋণের জামিন প্রদান করে, শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে প্রভৃতি।

৩. **ব্যবস্থাপক হিসাবে ভূমিকা (Role as Manager):** প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করাই হলো ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধির মূল কাজ। তারা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করত তা বাস্তবায়নের জন্য সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

৪. **অবলেখক হিসাবে ভূমিকা (Role as Underwriter):** যারা কোম্পানির হয়ে মূলধনের জন্য শেয়ার বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাদেরকে অবলেখক এবং তাদের কাজকে অবলেখন বলে। ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিগণ যখন দেখে যে-কোনো নতুন কোম্পানি শেয়ার বিক্রি করতে না পেরে অর্থ সংকটে ভোগে, তখন তারা এ দায়িত্ব গ্রহণ করে। বিনিময়ে তারা নির্দিষ্ট সময় পর কমিশন পেয়ে থাকে। জনগণ সাধারণত: নতুন কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করতে আগ্রহী হয় না। কারণ, এতে লভ্যাংশ পাওয়ার সম্ভাবন কম থাকে। এ পর্যায়ে প্রবর্তকগণ নিজেরাই অধিকাংশ শেয়ার ক্রয় করে নেয় এবং কিছু জনগণের মধ্যে বিক্রি করে। এই ভাবে ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিগণ অবলেখনের কাজ করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিগণ কোম্পানির মালিক নয়, তথাপি তারা মালিকদের করণীয় সব কার্যসম্পাদন করে থাকে। কোনো নতুন কোম্পানির উন্নতি ও সফলতার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে ব্যবসায় ও শিল্পের বিকাশে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি পদ্ধতির সুবিধাসমূহ
Advantages of Managing Agent System

বিনিয়োগকারীরা সাধারণত: বড় ধরনের বিনিয়োগের মাধ্যমে বড় কোম্পানি গঠনে উৎসাহী হয় না মূলধন হারানোর ভয়ে। কারণ, বড় ব্যবসায়ের ঝুঁকি বেশি। কিন্তু ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিগণ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করে উদ্যোক্তাদের ভয়কে দূর করে দেয়। এই ভাবে দেশে বড় বড় ব্যবসায় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। নীচে ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি পদ্ধতির সুবিধা বর্ণনা হলো:

১. **বিনিয়োগ বৃদ্ধি (Increase Investment):** ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে থাকে। বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য তারা বড় বড় বিনিয়োগকারী ও বিত্তবানদেরকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করে। এতে তারা বিনিয়োগে উৎসাহিত হয় এবং দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

২. **ঝুঁকি গ্রহণ (Taking Risk):** ব্যস্থাপনা প্রতিনিধিগণ শুধু ব্যবস্থাপনার দায়িত্বই পালন করে না, তারা ব্যবসায়ের ঝুঁকিও গ্রহণ করে। এতে বিনিয়োগকারীরা শিল্প ও ব্যবসায় স্থাপনে অধিক আগ্রহী হয়। এ দেশের বড় ধরনের শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি গ্রহণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. **অর্থ সংগ্রহের দায় গ্রহণ (Taking Liability of Financing):** নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান অর্থ সংকটে ভুগলে ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিগণ অর্থ সংগ্রহে সহায়তা করে থাকে। প্রয়োজনে নিজেরা শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে অর্থের সংস্থান করে।

৪. **ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার প্রয়োগ (Application of Efficiency of Management):** ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিগণ সাধারণত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষ হয়ে থাকে। নতুন কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি দক্ষতার সাথে সম্পাদনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সফলতা আনয়নে তারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৫. **শিল্পায়ন (Industrialization):** ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিদের ভূমিকার জন্যই মূলত: দেশের বিভিন্ন স্থানে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এতে দেশ শিল্পে সমৃদ্ধি লাভ করে এবং দেশের অর্থনীতি গতিশীলতা লাভ করে।

৬. **সহযোগিতা বৃদ্ধি (Increasing Co-operation):** ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে থাকে। ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। ব্যবস্থাপকগণই এর ব্যবস্থা করে থাকে।

৭. **ক্ষতিকর প্রতিযোগিতা হ্রাস (Reducing Destructing Competition):** ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিগণ যে সকল প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে থাকে, সেগুলোর মধ্যে একটি সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে ওঠে। এতে তাদের মধ্যে একে অপরকে ঘায়েল করার প্রতিযোগিতা হ্রাস পায়। তা ছাড়া, একই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যেও যাতে ক্ষতিকর প্রতিযোগিতার সৃষ্টি না হয়, ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিরা তার ব্যবস্থা করে থাকে।

৮. **মিতব্যয়িতা অর্জন (Gaining Economy):** কোনো কাজে মিতব্যয়িতা অর্জন করতে হলে সে কাজে অধিক দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন। ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি যেহেতু অধিক দক্ষতাসম্পন্ন, তাই প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা অর্জন করা সম্ভব হয়।

৯. **প্রশাসনিক সহযোগিতা (Aministrative Co-Operation):** ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে সমজাতীয় কিছু প্রতিষ্ঠানে কাজ করে থাকে। ফলে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সমজাতীয় ইউনিটগুলোর জন্য একই ধরনের ব্যবস্থাপনা চালু করতে পারে।

ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ

Disadvantages of Managing Agent System

ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি পদ্ধতির সুবিধার পাশাপাশি কতিপয় অসুবিধাও রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ:

১. **স্বৈরাচারী মনোভাব (Autocratic Attitude):** ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধির হাতে ব্যবস্থাপনার সমস্ত কর্তৃত্ব নিহিত থাকে, সে-ই সাথে আর্থিক ক্ষমতাও ভোগ করে। ফলে তাদের মধ্যে স্বৈরাচারী মনোভাবের সৃষ্টি হয়। এতে কর্মচারীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে পরিচালক কিংবা শেয়ারহোল্ডারদের তেমন কিছু করার থাকে না।

২. **অধিক আর্থিক সুবিধা ভোগ (Draining of Extra Financial Benefits):** ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধির হাতে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাকার ফলে কোম্পানির অভ্যন্তরীণ খুঁটি-নাটি অনেক কিছুই তাদের জানা থাকে। ফলে তারা অবৈধভাবে অনেক আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করে থাকে। এতে প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদে আর্থিক সমস্যায় পড়তে পারে।

৩. **স্বজনপ্রীতি (Nepotism):** ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি কোম্পানির বিভিন্ন পদে নিজেদের আত্মীয়স্বজনদেরকে নিয়োগ দেয়। এ পর্যায়ে তারা দক্ষতার বিচার করে না। ফলে অনেক অদক্ষ লোক কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করায় সার্বিক ব্যবস্থাপনা অদক্ষ হয়ে পড়ে। সুতরাং স্বজনপ্রীতি কোম্পানির জন্য একটি বড় অসুবিধা।

৪. **ব্যয়বহুল (Expensive):** ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিকে বড় অঙ্কের কমিশন প্রদান করতে হয়। ফলে এটি অনেকটা 'সাদা হাতি' পোষার সামিল বলে প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ, এ পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

৫. **অর্থের অপব্যবহার (Misuse of Money):** ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিগণ যেহেতু কোম্পানির কেউ নয়, তাই তারা কোম্পানির অর্থ অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার করতে পারে। এতে প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৬. **শেয়ারের ফট্‌কা ব্যবসায় (Speculation of Share):** ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি পদ্ধতির একটি অসুবিধা হলো- তারা কোম্পানির শেয়ার মূল্যকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে সুবিধাজনক সময়ে উচ্চমূল্যে তা বিক্রি করে দেয়। এতে করে বাজারে শেয়ারের দাম বেড়ে যায়। আবার বিপরীত ঘটনাও ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যাবলি, পরিচালকের পদশূন্যতা সম্পর্কে বর্ণনা করুন। ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধির সংজ্ঞা, কার্যাবলি, ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপ

কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাধারণত নিম্নলিখিত কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকেন- কোম্পানির প্রধান কার্যনির্বাহী হিসাবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক পরিষদ কর্তৃক গৃহীত নীতি-পদ্ধতি, সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন।তিনি কোম্পানির অধ:স্তন কর্মচারীদের সকল কাজকর্মের সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ করেন। পরিচালক পরিষদের মুখপাত্র হিসাবে তিনি কোম্পানির কাজকর্ম কোম্পানি আইন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করেন।কোম্পানির প্রতিনিধি হিসাবে তাকে কোম্পানির যাবতীয় সম্পত্তি ও অর্থের সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করতে হয়। তিনি কোম্পানির বিভিন্ন কর্মচারীদের দায়দায়িত্বের সীমা নির্দেশ করে দেন। কোম্পানির দৈনন্দিন কাজকর্ম যাতে নির্বিঘ্নে ও সাবলীল গতিতে চলতে পারে সে দিকেও তাকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালককে সরকারি বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সুষ্ঠু যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। ব্যবস্থাপনার উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্যে তিনি পরিচালনা পরিষদের নিকট সুপারিশ পেশ করে থাকেন। তিনি কোম্পানি কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, ছাঁটাই, বরখাস্ত ইত্যাদি কার্যসম্পাদন করে থাকেন।তাকে পরিচালনা পরিষদের নিকট ব্যবসায়সংক্রান্ত নানাবিধ তথ্য ও রিপোর্ট পেশ করতে হয়। কোম্পানি আইনের ১৮ ধারায় বর্ণিত হয়েছে যে, কী কী কারণে পরিচালকের পদ শূন্য হতে পারে। ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি হলো এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যারা যৌথ মূলধনি কোম্পানি পরিচালনা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীনে কোম্পানির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। সংশ্লিষ্ট কোম্পানির ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তারা পালন করে। ১৯৯৪ সালে কোম্পানি আইনে বলা হয়েছে যে, “কোনো ব্যক্তি, ফার্ম বা যৌথমূলধনি কোম্পানি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে পরিচালক পরিষদের নিয়ন্ত্রণে একটি যৌথ মূলধনি ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করলে তাকে ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি বলা হবে। কোনো দক্ষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধির কাজ করে থাকে। তারা সাধারণত: কোম্পানি গঠন, মূলধন সংগ্রহ ও সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে থাকে। এগুলো হলোঃ প্রবর্তকের কাজ, মূলধন সংগ্রহের কাজ, ব্যবস্থাপক হিসাবে ভূমিকা ও অবলেখক হিসাবে ভূমিকা। বিনিয়োগকারীরা সাধারণতঃ বড় ধরনের বিনিয়োগের মাধ্যমে বড় কোম্পানি গঠনে উৎসাহী হয় না মূলধন হারানোর ভয়ে। কারণ, বড় ব্যবসায়ের ঝুঁকি বেশি। কিন্তু ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিগণ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করে উদ্যোক্তাদের ভয়কে দূর করে দেয়। এভাবে দেশে বড় বড় ব্যবসায় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। নীচে ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি পদ্ধতির সুবিধাগুলো হলোঃ বিনিয়োগ বৃদ্ধি, ঝুঁকি গ্রহণ, অর্থ সংগ্রহের দায় গ্রহণ, ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার প্রয়োগ,শিল্পায়ন, সহযোগিতা বৃদ্ধি, ক্ষতিকর প্রতিযোগিতা হ্রাস, মিতব্যয়িতা অর্জন ও প্রশাসনিক সহযোগিতা। ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি পদ্ধতির সুবিধার পাশাপাশি কতিপয় অসুবিধাও রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপঃ স্বৈরাচারী মনোভাব, অধিক আর্থিক সুবিধা ভোগ, স্বজনপ্রীতি, ব্যয়বহুল, অর্থের অপব্যবহার, শেয়ারের ফট্‌কা ব্যবসায়।

পাঠ-৫.৪ বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে কোম্পানি ব্যবস্থাপনার ধরন; বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা চর্চার ধরন

Patterns of Private Sectors Company Management in Bangladesh; Management Practices of State-onwed Enterprises in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে কোম্পানি ব্যবস্থাপনার ধরন সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা চর্চার ধরন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে কোম্পানি ব্যবস্থাপনার ধরন

Patterns of Private Sectors Company Management in Bangladesh

বাংলাদেশে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কার্য ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের বিধান অনুসারে পরিচালিত হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রবর্তিত কোম্পানি ব্যবস্থাপনার ধরনকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা:

১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক ব্যবস্থাপনা;
২. ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি কর্তৃক ব্যবস্থাপনা; এবং
৩. সাধারণ ব্যবস্থাপক কর্তৃক ব্যবস্থাপনা।

১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক ব্যবস্থাপনা (Management by Managing Direction): যৌথ মূলধনি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির প্রকৃত মালিক কোম্পানির ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ব্যাপারে তাদের কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকে না। শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক নির্বাচিত পরিচালক পরিষদের উপর কোম্পানির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। কোম্পানি সংঘবিধি বা পরিমেল নিয়মাবলী হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলে পরিচালক পরিষদ তাদের নিজেদের মধ্য হতে একজনকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিযুক্ত করে। তার উপর কোম্পানির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। এ জাতীয় প্যাটার্নকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক ব্যবস্থাপনা বলা হয়। আমাদের দেশের ব্যাংকিং ও বিমা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অধিক প্রচলিত। নিম্নোক্ত ছকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি দেখানো হলো:

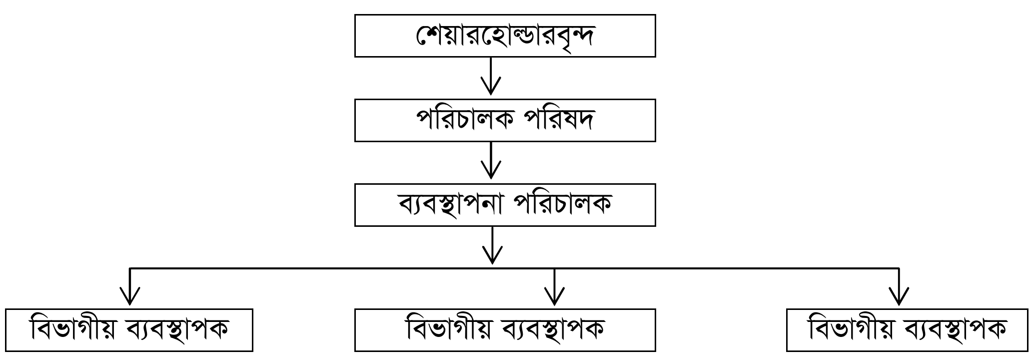

চিত্র: ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

২. ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি কর্তৃক ব্যবস্থাপনা (Management by Managing Agent): বাংলাদেশে কিছু কিছু কোম্পানিতে ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি কর্তৃক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিচালিত হয়। এ ধরনের ব্যবস্থাপনায় ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিগণ কোম্পানির সাথে একটি চুক্তির মাধ্যমে কোম্পানির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। চুক্তিতে অন্য কোনোরূপ

নির্দেশ না থাকলে তারা পরিচালক পরিষদের তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কার্যসম্পাদন করেন। ব্যবস্থাপক প্রতিনিধি কোনো বিশেষ ব্যক্তি, অংশীদারি ফার্ম কিংবা যৌথ মূলধনি কোম্পানি হতে পারে। ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত ব্যবস্থাপনা প্যাটার্ন নিম্নে দেখানো হলো:

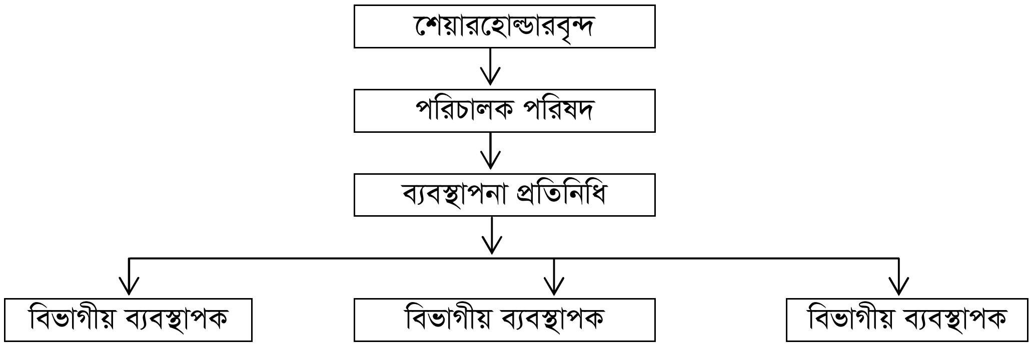

চিত্র: ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি কর্তৃক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

৩. **সাধারণ ব্যবস্থাপক কর্তৃক ব্যবস্থাপনা (Management by General Manager):** বাংলাদেশে অনেক কোম্পানিতে ব্যবস্থাপক কর্তৃক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসৃত হয়। এ পদ্ধতিতে পরিচালক পরিষদ সাধারণ ব্যবস্থাপক বা জেনারেল ম্যানেজার নিযুক্ত করে তার উপর কোম্পানির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করে থাকেন। জেনারেল ম্যানেজারের অধীনে বা নিয়ন্ত্রণাধীনে বিভিন্ন বিভাগের জন্য একজন করে বিভাগীয় ব্যবস্থাপক নিয়োগ করা হয়। বিভাগীয় ব্যবস্থাপকগণ নিজ নিজ বিভাগের কার্যাবলির জন্য জেনারেল ম্যানেজার বা সাধারণ ব্যবস্থাপকের নিকট দায়ী থাকেন। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে এ জাতীয় ব্যবস্থাপনার ধরন দেখানো হলো:

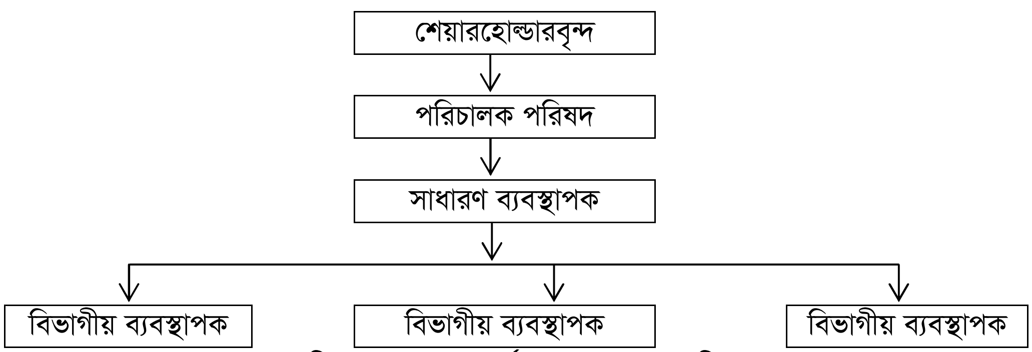

চিত্র: ব্যবস্থাপক কর্তৃক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

বাংলাদেশে যৌথ মূলধনি কোম্পানিগুলোর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উল্লিখিত তিন প্রকার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বা ব্যবস্থাপনা প্যাটার্ন অনুসৃত হতে দেখা যায়।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ

Management Practices of State-onwed Enterprises in Bangladesh

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ এবং এ দেশের শতকরা ৮৫ ভাগ লোক কৃষক। তাই এ দেশের শিল্পের ভিত্তি খুব ছোট। জিডিপি-তে শিল্পের অবদান বিগত দিনগুলোতে দশ শতাংশে সীমাবদ্ধ রয়েছে। ব্রিটিশ শাসনামল হতেই এ দেশের শিল্পের ধরনটি ছিল পাবলিক সেক্টর। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) মোট শিল্পের মাত্র দুই শতাংশ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল অর্থাৎ খুবই নগন্য সংখ্যক শিল্প নিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছিল। এ সকল শিল্পের অধিকাংশ পাকিস্তানীদের মালিকানায় ছিল। ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাথে যুদ্ধ হয় হয় এবং একই

সালের ১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হয়। যেহেতু অধিকাংশ ব্যবসায়-বাণিজ্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী। তাই যুদ্ধের সময় তারা এদেশ ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যায়। অতএব স্বাধীনতার পর এ দেশের শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের পরিচালনার ক্ষেত্রে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়। সে সময় পরিত্যক্ত শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সরকারী ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে পাট, বস্ত্র ও চিনি শিল্পসহ সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠান সরকারি মালিকানায় নিয়ে আসা হয়। ফলশ্রুতিতে ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানে সরকারি মালিকানা দ্বারায় বিরানব্বই শতাংশ। ১৯৭৬ সনে রাষ্ট্রপতির ২৭তম আদেশ বলে দেশের সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে BJMC, BTMC ও BFIDC সহ ছয়টি কর্পোরেশন গঠন করা হয়।

এদের অধীনে ৩৮৬ টি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। এ করপোরেশনগুলো স্বায়ত্বশাসন ভোগ করে থাকে। তবে তাদেরকে সরকারি বিধি-বিধান মোতাবেকই চলতে হয়। এ করপোরেশনগুলো জাতীয় সংসদে আইন পাশের মাধ্যমে কিংবা রাষ্ট্রপতির নির্বাহী আদেশ বলে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে এদেরকে বিধিবদ্ধ সংস্থাও বলা হয়। মূলত: এগুলো সরকারি প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনার ধরন ভিন্ন প্রকৃতির। নিম্নে ব্যবস্থাপনার ধরন সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা চর্চা

Management of State-owned Enterprises

রাষ্ট্র বা সরকারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে যে সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়, ঐ সকল প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বলে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো সরাসরি রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হতে পারে কিংবা বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের মাধ্যমে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীনে আনা হতে পারে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে তিন স্তরভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্রচলিত, যেমন:

১. শীর্ষ বা সর্বোচ্চ বা ১ম স্তর (মন্ত্রণালয়/জাতীয় সংসদ);
২. মধ্যম বা ২য় স্তর বা করপোরেশন স্তর (করপোরেশন বা বিধিবদ্ধ সংস্থা); এবং
৩. তৃতীয় বা সর্বশেষ স্তর বা প্রাতিষ্ঠানিক স্তর। নিম্নে একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে ত্রি-স্তর বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি দেখানো হলো:

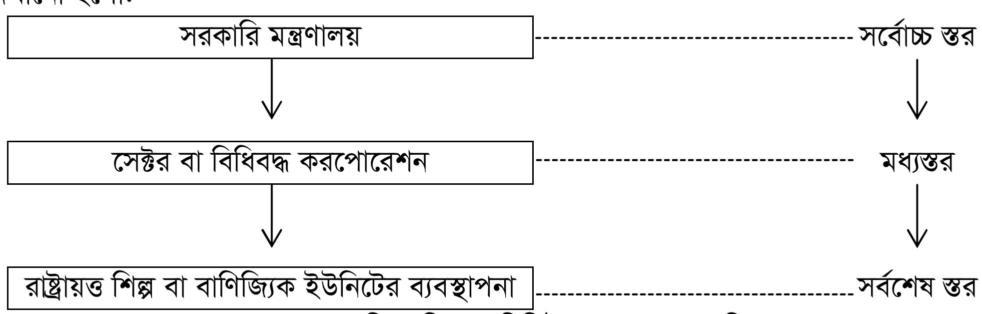

চিত্র: ত্রি-স্তর বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

১. সরকারি মন্ত্রণালয় বা বিভাগ (Government Ministry or Departments): রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়সমূহের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার সর্বোচ্চ স্তর হলো সরকারি মন্ত্রণালয় বা বিভাগ। ব্যবস্থাপনা কাঠামোর এ স্তরে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের উপর রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ইউনিট প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরাসরি বা সংশ্লিষ্ট করপোরেশনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। শিল্প ইউনিটগুলোর ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালনার জন্য মন্ত্রণালয় এর আওতাভুক্ত করপোরেশনের চেয়ারম্যান ও পরিচালনা বোর্ড গঠন করেন এবং নীতিমালা নির্ধারণ করে দেন। করপোরেশনের প্রণীত বাজেট ও অন্যান্য পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ই অনুমোদন করেন। মন্ত্রণালয় করপোরেশনের যাবতীয় আর্থিক কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ করেন এবং করপোরেশন তার যাবতীয় কাজের জন্য মন্ত্রণালয়ের নিকট দায়ী থাকে। উদাহরণস্বরূপ রেডিও ও টেলিভিশন তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক, অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

২. সেক্টর বা বিধিবদ্ধ করপোরেশন (Sector or Statutory Corporation): সেক্টর করপোরেশন এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। বাংলাদেশে কতকগুলো সেক্টর করপোরেশন রয়েছে এরা সরকারের নীতিমালা অনুসারে এদের আওতাধীন রাষ্ট্রীয় কলকারখানাগুলো নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ করপোরেশন প্রত্যক্ষভাবে কোনো বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকে না। এর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক এর আওতাধীন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা বিধিবদ্ধ সংস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সেক্টর করপোরেশন এর আওতাভুক্ত সংস্থাগুলো এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। এটি সরকারি নির্দেশানুসারে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনা কাঠামো দাঁড় করায়, পদস্থ কর্মচারী নিয়োগ ও বদলি করে এবং বাজেট পরীক্ষা ও অনুমোদন করে।

সেক্টর করপোরেশনের পরিচালনার জন্য একটি পরিচালক পরিষদ (Board of Dierctors) থাকে। চেয়ারম্যান এই পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি করপোরেশনের কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর নিকট দায়ী থাকেন। সচিব পরিচালক পরিষদেও মুখপাত্র হিসাবে কাজ করেন। নিম্নের চিত্রে সেক্টর করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা কাঠামো দেখানো হলো:

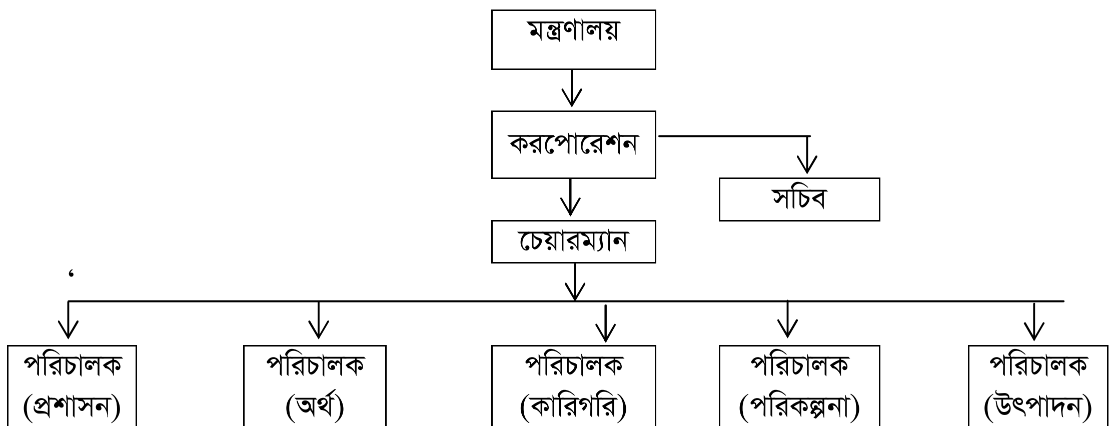

চিত্র: সেক্টর করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা কাঠামো

সেক্টর করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা বোর্ড বা পরিচালক পরিষদ করপোরেশনের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যাবলি; সাধারণ বাজেট, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, ব্যবস্থাপনা, তথ্য ব্যবস্থা, হিসাবপত্র পরীক্ষা ইত্যাদি পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ- বাংলাদেশ পাটকল সংস্থা বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়াত্ত পাটকলগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

৩. রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প বা বাণিজ্যিক ইউনিটের ব্যবস্থাপনা (Management of Nationalised Industrial or Commercial Units): বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায়সমূহের ব্যবস্থাপনার এটি তৃতীয় বা সর্বশেষ স্তর। এ স্তরে তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের নিজস্ব ব্যবস্থাপনা কাঠামো থাকে। এতে প্রতিটি ইউনিটে একটি পরিচালনা পরিষদ বা ব্যবস্থাপনা বোর্ড থাকে। নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে এ ব্যবস্থাপনা বোর্ড গঠিত হয়।

১।	সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য	১ জন
২।	প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বা প্রতিনিধি	১ জন
৩।	ব্যাংকের প্রতিনিধি	১ জন
৪।	শ্রমিক প্রতিনিধি	১ জন
	মোট	৪ জন

এই চার সদস্যবিশিষ্ট পরিচালনা বোর্ডের একজন চেয়ারম্যান বা সভাপতি থাকে। সংশ্লিষ্ট ইউনিট বা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা যাবতীয় কাজের জন্য করপোরেশনের পরিচালক বোর্ডের নিকট দায়ী থাকে। করপোরেশনের পরিচালক বোর্ড শিল্প ইউনিটের উচ্চপদস্থ অফিসারদের বদলি, প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ সরকারি ও বেসরকারি খাতের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কার্য ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের বিধান অনুসারে পরিচালিত হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রবর্তিত কোম্পানি আইন ব্যবস্থাপনার ধরনকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা: ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক ব্যবস্থাপনা, ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি কর্তৃক ব্যবস্থাপনা এবং সাধারণ ব্যবস্থাপক কর্তৃক ব্যবস্থাপনা। রাষ্ট্র বা সরকারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে যে সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়, ঐ সকল প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বলে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো সরাসরি রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হতে পারে কিংবা বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের মাধ্যমে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীনে আনা হতে পারে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে তিন স্তরভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্রচলিত; যেমন: শীর্ষ বা সর্বোচ্চ বা ১ম স্তর : (মন্ত্রণালয়/জাতীয় সংসদ); মধ্যম বা ২য় স্তর বা করপোরেশন স্তর (করপোরেশন বা বিধিবদ্ধ সংস্থা); এবং তৃতীয় বা সর্বশেষ স্তর বা প্রাতিষ্ঠানিক স্তর।

পাঠ-৫.৫ জাপানের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি; যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি; দক্ষিণ কোরিয়ার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি; ফ্রান্সের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

Management System of Japan; Management System of United States; Management System of South Korea; Management System of France

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জাপানের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- দক্ষিণ কোরিয়ার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- ফ্রান্সের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

জাপানের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

Management System of Japan

জাপান এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে অধিক শিল্পোন্নত দেশ। বিশ্বের অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশগুলো জাপানের এ উন্নতি অবলোকন করে রীতিমত বিস্ময়ে হতবাক। এই জন্য জাপানের প্রতিটি নাগরিক অত্যন্ত আন্তরিক। এ ছাড়াও জাপানের কয়েকটি শিল্পগোষ্ঠীর নাম সারা দুনিয়াতে বিস্তৃত। এদের মধ্যে জাইবাৎসদের নাম উল্লেখযোগ্য। কারণ, তাদের সুনাম ও মর্যাদা ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে অবদান রাখে।

জাপানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য

The Basic Characterstics of Japanese Management

জাপান একটি গণতান্ত্রিক দেশ। জাপানে বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান করপোরেশন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। এ সকল কর্পোরেশনের মালিকগণ ও ব্যবস্থাপনা আমাদের দেশের পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার মতোই।

জাপানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য

Special Features of Japanese Management

জাপানি ব্যবস্থাপনা সফলতার চূড়ান্তে পৌছেছে- এটি সহজেই প্রতীয়মান হয় বিশ্ববাজারে জাপানি পণ্যের দৌড় দেখে। অর্থাৎ, জাপানের পণ্যসামগ্রী বিশ্ববাজারের অধিকাংশ দখল করে রেখেছে। ভোগ্যপণ্য থেকে শুরু করে শিল্পপণ্য, ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী প্রভৃতি উৎপাদনের ক্ষেত্রে জাপান অভূতপূর্ব সফলতা দেখিয়েছে। এ সফলতার মূলে রয়েছে জাপানের ব্যবস্থাপনা সিস্টেম। নীচে এ ব্যবস্থাপনার কতিপয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো:

১. যৌথ দায়িত্ব (Joint Responsibility): যৌথ দায়িত্ব বলতে বুঝায় যে, কোনো কাজের ক্ষেত্রে দায়দায়িত্ব কারো একার নয় বরং সকলের। অর্থাৎ, কোনো কাজের সফলতার স্বীকৃতি যেমন ব্যবস্থাপক বা কারো একার নয় তেমনি বিফলতার দায়িত্বও ব্যবস্থাপনা বা কারো একার নয়। এক্ষেত্রে তারা নির্দিষ্ট কারো উপর দায়িত্ব না চাপিয়ে বরং সকলে মিলে তা স্বীকার করে নেয়। এ যেন সমবায়ের মূলমন্ত্র। সুতরাং এ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ব্যক্তির পরিবর্তে দলের স্বীকৃতি ও দলগত অনুভূতিই প্রধান। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক সদস্যদের অত্যন্ত কাছাকাছি থাকে এবং একজন গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে থাকেন।

২. অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা (Participative Management): অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনার অর্থ হলো কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শ্রমিক-কর্মীদের মতামত গ্রহণ করা। জাপানে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও শ্রমিক-কর্মীও ব্যবস্থাপনার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলাপ-আলোচনার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তাই জাপানি ব্যবস্থাপনাকে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা বলা হয়। যে-কোনো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেও ব্যবস্থাপকদের তুলনায় শ্রমিক-কর্মীদের মতামতকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এটি উইলিয়াম ওচি প্রদত্ত 'Z' তত্ত্বেও বলা হয়েছে। জাপানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে

'রিঙ্গি' বলে। আর রিঙ্গি অনুযায়ী যে সুপারিশমালা তৈরি করা হয় তাকে বলা হয় 'রিঙ্গিসু'। সুতরাং জাপানে রিঙ্গিসু অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা হয় যা 'Z'তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৩. **আন্তরিক শিল্প-সম্পর্ক (Hearty Industrial Relations):** শিল্পের উন্নয়নে অবদান রাখার উপাদানসমূহের মধ্যে ভালো শিল্প-সম্পর্ক অন্যতম। জাপানের শিল্প-সম্পর্ক বিশ্বের যে-কোনো দেশের শিল্প-সম্পর্কের চেয়ে আন্তরিক ও অন্যতম। শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে সম্পর্কটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল। তাই এ সম্পর্ক যত মধুর হবে, শিল্পের উন্নয়ন তত বেশি হবে। জাপানের শিল্প-সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য হলো- শিল্প মালিকগণ প্রতিটি বিষয়ে শ্রমিকদের সাথে আলোচনা করে নেয়। এমনকি তারা দরকষাকষিও করে, যেন প্রতিষ্ঠানের কোনো ক্ষতি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখে।

৪. **জীবনভর চাকরি (Life Time Employment):** জাপানি ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হলো কর্মীদের আজীবন চাকরির ব্যবস্থা। সেখানকার বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে আজীবন চাকরি করার বা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আছে। এ ব্যবস্থায় কোনো শ্রমিক-কর্মী কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বহাল থাকতে পারে। জাপানি ভাষায় এটিকে 'নেনকো' বলা হয়। 'নেনকো' প্রবর্তনের ফলে কর্মীরা একদিকে চাকরির নিরাপত্তা বোধ করে; অন্যদিকে কাজে অনুপ্রেরণা লাভ করে। কারণ, প্রতিষ্ঠানকে তারা নিজের ভাবতে পারে। এ পদ্ধতিতে জ্যেষ্ঠতা ও মেধার ভিত্তিতে পদোন্নতি দেওয়া হয়। ফলে একদিকে জ্যেষ্ঠতার মূল্যায়ন করা হয়। অন্যদিকে মেধাও অবহেলিত হয় না। এ ব্যবস্থায় শ্রমিক-কর্মীদের ছাঁটাই করা হতো না, বরং এক শাখা থেকে অন্য শাখায় বদলি করা হতো, যাতে সংশ্লিষ্ট কর্মী দক্ষ হতে পারে। ১৯৮০ সাল থেকে 'নেনকো' প্রবর্তনের পর থেকে অদ্যাবধি এটি সফলতার সাথে জাপানের ব্যবস্থাপনায় কাজ করে যাচ্ছে।

৫. **প্রশিক্ষণ (Training):** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মীদেরকে অবিরত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এতে তাদের মেধার বিকাশ ঘটে। এতে তাদের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। তাদের প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্যই হলো কার্যের উন্নয়ন সাধন করা; অর্থাৎ, কর্ম দক্ষতা বাড়ানো, পদোন্নতি নয়। বাস্তবতার সাথে মিল রেখে কর্মীদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

৬. **মান নিয়ন্ত্রণ (Quality Control):** প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে প্রতিযোগিতা মোকাবিলার লক্ষ্যে জাপানের শিল্পপ্রতিষ্ঠানে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে। তাই জাপানের পণ্য বিশ্বসেরা। জাপানি ব্যবস্থাপনায় "মান নিয়ন্ত্রণ চক্র" (Quality Control Cycle) নামে মান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি রয়েছে। এ পদ্ধতিটি প্রতিটি শ্রমিক-কর্মী নিজেরাই নিজেদের উৎপাদনের মান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। প্রয়োজনে সংশোধনমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারে। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক শ্রমিক-কর্মীই কোনো না কোনো মান নিয়ন্ত্রণ চক্রের সাথে জড়িত। ফলে চলমান উৎপাদনের সাথে মান নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

৭. **পিতৃসুলভ মানবিক সম্পর্ক (Fathernatistic Human Relations):** জাপানি ব্যবস্থাপনায় মালিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ শ্রমিক-কর্মীদের সাথে পিতৃসুলভ আচরণ করবে এ মর্মে নির্দেশনা থাকে। ফলে তারা শ্রমিক-কর্মীদেরকে সন্তানের মতো স্নেহ করে থাকে। এ বিষয়ে আমাদের দেশে সংস্কৃতির সাথে মিল রয়েছে। তা হলো জাপানিগণ বয়োজ্যেষ্ঠদের যথেষ্ট সম্মান করে এবং বয়োজ্যেষ্ঠরাও ছোটদেরকে স্নেহ করে। ফলে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক-কর্মীরা কাজে উদ্বুদ্ধ হয়। শ্রমিকদের যে-কোনো প্রয়োজনে মালিকপক্ষ কিংবা ব্যবস্থাপনা এগিয়ে আসে।

সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে, জাপানি ব্যবস্থাপনা উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। শিল্পের উন্নয়নে জাপানি ব্যবস্থাপনার অবদান অনস্বীকার্য।

যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা

Management of United States

যুক্তরাষ্ট্র একটি পুঁজিবাদী দেশ। এটি শিল্পে অত্যন্ত উন্নত। তাই এর ব্যবস্থাপনার মানও উন্নত। এ দেশ থেকেই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সূত্রপাত। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপঃ

১. **স্বল্পমেয়াদি নিয়োগ (Short-time Employment):** যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিষ্ঠানে স্বলমেয়াদের জন্য শ্রমিক-কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়। পূর্ণজীবনকালীন নিয়োগ দেওয়া হয় না।

২. **প্রতিনিধিত্ব (Agentship):** উচ্চ ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে শ্রমিক-কর্মীদের প্রতিনিধিত্ব নাই। অনেকটা স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার মত।

৩. **বিশেষীকরণ (Specialization):** কার্যক্ষেত্রে বিশেষীকরণ যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ যিনি যে কাজের বিশেষজ্ঞ, তাকে সে-ই কাজ দেওয়া হয়। এতে দক্ষতার সাথে কার্যসম্পাদন করা যায়।

৪. **দ্রুত মূল্যায়ন ও পদোন্নতি (Rapid Appraisal & Promotion):**যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনার আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো- কর্মীদের দ্বারা সম্পাদিত কার্যাবলি মূল্যায়ন করে সে অনুযায়ী পদোন্নতি দেওয়া হয়। এতে শ্রমিক-কর্মীদের মনোবল উচ্চ হয়।

৫. **ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ (Comprehensive Control):** এ ব্যবস্থাপনায় কর্মীদের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে বিচ্যুতির সংখ্যা কমে যায়।

৬. **বিপণন ও বিক্রয় প্রসার (Marketing & Sales Promotion):** যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা উৎপাদনের তুলনায় পণ্যের বিপণন ও বিক্রয় প্রসারে অধিক অর্থ ব্যয় করে।

৭. **পরিচালনা পরিষদ (Board of Directors):** যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় প্রতিষ্ঠানে শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক পরিচালনা পরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হয়ে থাকে। শেয়ারহোল্ডাররা এ পরিষদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে তাদের মালিকানা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

৮. **ব্যক্তিক দায়-দায়িত্ব (Individual Responsibility):** যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনার প্রতিটি শ্রমিক, কর্মী ও কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনের সুনির্দিষ্ট বিবরণ দিয়ে থাকে। ফলে সকলেই তাদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে বাধ্য হয় এবং প্রত্যেককে এর জন্য জবাবদিহি করতে হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত উঁচুমানের। এক্ষেত্রে প্রত্যেকেই তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন।

দক্ষিণ কোরিয়ার ব্যবস্থাপনা

Management of South Korea

দক্ষিণ কোরিয়া একটি অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী দেশ। তবে কোরিয়ার ব্যবস্থাপনা ততা পরিচিত নয়। অনেকে মনে করতে পারেন যে, এটি জাপানি ব্যবস্থাপনার অনুরূপ, কিন্তু মূলত তা নয়। নীচে কোরিয়ার ব্যবস্থাপনার কতিপয় বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো:

১. কোরিয়ার ব্যবস্থাপনায় কোরিয়ান শব্দ (চেবল) (Chaebol) প্রচলিত। যার অর্থ সরকার ও বৃহৎ শিল্পের মধ্যে দ্বন্দ্ব। অর্থাৎ সরকারের সাথে বৃহৎ শিল্পের মালিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান।
২. জাপানি শব্দ Wa কোরিয়াতে inhaw নামে প্রচলিত। এর অর্থ দলগত সম্পর্ক। তবে কোরিয়াতে দলগত মূল্যায়ন কম।
৩. প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ জাপানের মতো সারা জীবনের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হয় না।
৪. কোরিয়ার ব্যবস্থাপনায় ক্রমপর্যায় মেনে চলে।
৫. কোরিয়ার বড় বড় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় সাধারণত উচ্চ পদে নিজস্ব আত্মীয়স্বজনরা অবস্থান করে। তবে আত্মীয় না থাকলে একই এলাকার লোককে উচ্চপদে আসীন করা হয়।
৬. কোরিয়ার ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্বের ধরন হলো স্বৈরতান্ত্রিক।
৭. জাপানের তুলনায় কোরিয়ার প্রতিষ্ঠানগুলোতে শ্রমিক আবর্তন হয় অনেক বেশি।

ফ্রান্সের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

Management System of France

ফ্রান্স একটি শিল্পোন্নত দেশ। উল্লেখ্য যে, এ দেশে যথেষ্ট আধুনিক ব্যবস্থাপনার সূত্রপাত হয়েছিল। এ দেশে সরকারিভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, এমনভাবে তা যেন ব্যক্তিক বা বেসরকারি কোম্পানি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সহায়ক হয়। কারণ,

সরকারের উদ্দেশ্য হলো দেশের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং অর্থনৈতিক নয় এমন খাতসমূহকে নিরুৎসাহ করা। যাহোক, ফ্রান্সের ব্যবস্থা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

১. সরকার আঞ্চলিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকেন, যা বাস্তবায়নে বিনিয়োগকারী সংগঠন, ইউনিয়ন, ভোক্তা, সরকারের অন্যান্য বিভাগ প্রভৃতি সহায়তা করে।
২. সম্প্রতি সরাসরি পরিকল্পনা বৈষয়িক কৌশলে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে ইলেক্ট্রনিক্স সেক্টরের উন্নয়নে সহযোগিতা করার জন্য।
৩. সরকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।
৪. বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় সরকারি প্রতিষ্ঠানে সুযোগ-সুবিধা বেশি, চাকরির নিরাপত্তাও বেশি। তাই ফ্রান্সে মানুষ সরকারি চাকরিতে যোগদানে আগ্রহী।
৫. নামি-দামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চাকরি ক্ষেত্রের জন্য ব্যবস্থাপক তৈরি ও সরবরাহ করে থাকে।
৬. ব্যবস্থাপনা সমস্যা সমাধানে গাণিতিক বিশ্লেষণ বেশি ব্যবহার করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করুন এবং খাতায় লিপিবদ্ধ করুন।

সারসংক্ষেপ

জাপান এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে অধিক শিল্পোন্নত দেশ। বিশ্বের অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশগুলো জাপানের এ উন্নতি অবলোকন করে রীতিমতো বিস্ময়ে হতবাক। এ জন্য জাপানের প্রতিটি নাগরিক অত্যন্ত আন্তরিক। এ ছাড়াও জাপানের কয়েকটি শিল্পগোষ্ঠীর নাম সারা দুনিয়াতে বিস্তৃত। এদের মধ্যে জাইবাৎসদের নাম উল্লেখযোগ্য। কারণ, তাদের সুনাম ও মর্যাদা ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে অবদান রাখে। জাপান একটি গণতান্ত্রিক দেশ। জাপান বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান করপোরেশন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। এ সকল করপোরেশনের মালিকগণ ও ব্যবস্থাপনা আমাদের দেশের পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার মতই। এ ব্যবস্থাপনার কতিপয় বৈশিষ্ট্য হলো: ১. যৌথ দায়িত্ব ২. অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা ৩. আন্তরিক শিল্প-সম্পর্ক ৪. জীবনভর চাকরি ৫.প্রশিক্ষণ ৬.মান নিয়ন্ত্রণ ৭.পিতৃসুলভ মানবিক সম্পর্ক। যুক্তরাষ্ট্র একটি পুঁজিবাদী দেশ। এটি শিল্পে অত্যন্ত উন্নত। তাই এর ব্যবস্থাপনার মানও উন্নত। এ দেশ থেকেই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সূত্রপাত। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ: ১.স্বল্পমেয়াদি নিয়োগ ২.প্রতিনিধিত্ব ৩. বিশেষীকরণ ৪. দ্রুত মূল্যায়ন ও পদোন্নতি ৫. ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ ৬.বিপণন ও বিক্রয় প্রসার ৭. পরিচালনা পরিষদ ৮.ব্যক্তিক দায়-দায়িত্ব। দক্ষিণ কোরিয়া একটি অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী দেশ। তবে কোরিয়ার ব্যবস্থাপনা ততা পরিচিত নয়। অনেকে মনে করতে পারেন যে, এটি জাপানি ব্যবস্থাপনার অনুরূপ, কিন্তু মূলত তা নয়। ফ্রান্স একটি শিল্পোন্নত দেশ। উল্লেখ্য যে, এ দেশে যথেষ্ট আধুনিক ব্যবস্থাপনার সূত্রপাত হয়েছিল। এ দেশে সরকারিভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, এমনভাবে তা যেন ব্যক্তিক বা বেসরকারি কোম্পানির পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়ক হয়। কারণ, সরকারের উদ্দেশ্য হলো দেশের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং অর্থনৈতিক নয় এমন খাতসমূহকে নিরুৎসাহ করা।

পাঠ-৫.৬ জার্মানির ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি; চীনের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি; যুক্তরাজ্যের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

Management System of Germany; Management System of Chinese; Management System of United Kingdom

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জার্মানির ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- চীনের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- যুক্তরাজ্যের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

জার্মানির ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

Management System of Germany

জামার্নি বিশ্বের শিল্পায়িত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। এটি ইউরোপের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক শক্তি। উন্নত প্রযুক্তিই জামার্নির শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উন্নতির মূল কারণ। তবে উন্নত প্রযুক্তির পাশাপাশি জার্মানির ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শিল্পের উন্নয়নে অবদান রাখে। জামার্নিতে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বলতে সহ-নির্ধারণ পদ্ধতিকে (Co-ordination System) বুঝায়। এক্ষেত্রে শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বলে এটিকে সহ-নির্ধারণ পদ্ধতি বলে। এ ব্যবস্থায় শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে খুবই ঘনিষ্ট ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে সুসম্পর্কের কারণেই শিল্পপ্রতিষ্ঠানে উৎপাদন ব্যহত হয় না। এ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপকের ভূমিকা হলো একজন শ্রমিকের মতো। অর্থাৎ ব্যবস্থাপক একজন দক্ষ শ্রমিক এবং তিনি শ্রমিকদের একজন সাহায্যকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। আর তাই শ্রমিক-ব্যবস্থাপকদের সম্পর্ক ঊর্ধ্বতন-অধস্তন নয় বরং সহ-অবস্থানের সহ-নির্ধারণের হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, এ সম্পর্কই জার্মানির ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মূল বিশেষত্ব।

জার্মানির ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য

Characterstics of Management of Germany

জামার্নির ব্যবস্থাপনার মূল দর্শন হলো সহ-নির্ধারণি ব্যবস্থা (Co-ordination System)। অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠানের যে-কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই জার্মানির ব্যবস্থাপনার মূল বৈশিষ্ট্য। নীচে এর বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরা হলো:

১. **গণতন্ত্র (Democracy):** জার্মানির ব্যবস্থাপনায় গণতান্ত্রিক ধারা বিদ্যমান। কারণ, প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে শ্রমিক-কর্মী ও ব্যবস্থাপনা একত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

২. **কার্য বিশেষীকরণ (Work Specialization):** এ ব্যবস্থাপনার আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো শ্রমিক-কর্মীগণ যে যে কাজে দক্ষ, তাকে সেই কাজেই দেওয়া হয়। অর্থাৎ, দক্ষতাই এ ব্যবস্থাপনার মূল বিষয়।

৩. **পণ্য ও সেবার মান (Standard of Product or Service):** পণ্য ও সেবার মানোন্নয়নই ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্ব। তারা এ বিষয়ে দ্রুত কাজ করে।

৪. **প্রেষণামূলক পদক্ষেপ (Motivational Steps):** শ্রমিক-কর্মীগণ যেন আনন্দের সাথে কাজ করতে পারে সেই জন্য ব্যবস্থাপকগণ প্রেষণামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

৫. **ব্যবস্থাপকগণ সম্মানিত ব্যক্তি (Managers are Honoured):** জার্মানি ব্যবস্থাপকগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তারা সরকারের নিকট থেকে বা কারো নিকট থেকে কোনো সাবসিডি বা অনুদান গ্রহণ করে না। এটিকে তারা অসন্তোষজনক মনে করেন। তাই তারা সমাজে সম্মানিত।

৬. **সময়ানুবর্তিতা (Timeliven):** ব্যবস্থাপকগণ অত্যন্ত সময়ানুগ। তারা সময়ের কাজ সময়ে করতেই বেশি পছন্দ করেন। সময় মেনে না চলা তাদের নিকট বড় ধরনের অপরাধ।

পরিশেষে বলা যায় যে, জার্মানির ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান।

চীনের ব্যবস্থাপনার ধরন

The Chinese Management System

চীন সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক দেশ। এটি বিশ্বের একটি জনবহুল দেশ। এর আয়তন ৯৬,০০,০০০ বর্গ কি. মি. এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১৫০ কোটি। যেহেতু এটি সমাজতান্ত্রিক দেশ, তাই এর প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনার ধরন অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ধরনের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। চীনের প্রতিষ্ঠানগুলোতে মূলত: শ্রমিকদেরকে প্রতিষ্ঠা করাই ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য। তাই সমাজতান্ত্রিক উপায়ে ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালিত হয়ে থাকে। সরকার কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে থাকে। সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অর্থাৎ, সর্বত্রই কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করা হয়। নীচে চীনা ব্যবস্থাপনার কতিপয় বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো:

১. **পরিকল্পনা প্রণয়ন (Planning):** চীনের ব্যবস্থাপনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো মন্ত্রণালয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারে। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিকল্পনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে জানাতে হয়। উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী কেন্দ্রীয়ভাবে বণ্টিত হয়। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা বাৎসরিক ভিত্তিতে হয়ে থাকে। তবে এটিকে আবার ষান্মাসিক, মাসিক ও দৈনন্দিন পরিকল্পনায় বিভক্ত করা হয়।

২. **অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা (Participative Management):** চীনের প্রতিষ্ঠানগুলোতে শ্রমিকদের অংশগ্রহণে সকল ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। শ্রমিকদের মতামতকে মূল্যায়ন করা ও তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই এ ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য।

৩. **আমলাতান্ত্রিক নির্দেশনা (Bureaucratic Direction):** চীনের প্রতিষ্ঠানমূহে কেন্দ্রীয়ভাবে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সরকারের উচ্চমহলো হতে এ সকল নির্দেশনা মন্ত্রণালয়, পার্টির কমিটি, সংগ্রাম কমিটি কর্তৃক প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে পৌছানো হয়।

৪. **আদর্শগত প্রেষণা (Moral Motivation):** চৈনিক ব্যবস্থাপনার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো আর্থিক প্রেষণার পরিবর্তে নৈতিক প্রেষণার উপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে তারা উৎপাদনের বিভিন্ন হারের উপর ভিত্তি করে মজুরি প্রদান করে। অর্থাৎ তারা এখন আর্থিক প্রণোদনার প্রতি মনোনিবেশ করেছে।

৫. **কেন্দ্রীয় সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ (Central Co-ordinating & Controlling):** চীনে প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কেন্দ্র কর্তৃক সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণের কাজ সম্পাদন করা হয়। বিভিন্ন প্রদেশে রাষ্ট্রীয় কাউন্সিলের বিভিন্ন শাখা ও কমিশনের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় বিভিন্ন অঞ্চল, মিউনিসিপ্যালিটি, প্রদেশ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় সরকার সরাসরি ভূমিকা রাখে।

সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে, উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী চৈনিক ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তবে তা অবশ্যই শ্রমিক-কর্মী ও দেশের মেহনতি মানুষের উন্নয়নকে প্রতিফলিত করে।

যুক্তরাজ্যের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

Management System in United kingdom (UK)

শিল্পবিপ্লবের কথা আমরা সবাই জানি; যা যুক্তরাজ্যেই প্রথম সংঘটিত হয়। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে। ১৮৫০ - ১৯০০ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ড ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় শিল্প উৎপাদনে অনেক এগিয়ে যায়। উন্নতমানের শিল্প ব্যবস্থাপনা চালু করার ফলে পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশ তাকে অনুসরণ করতে থাকে। ইংল্যান্ডে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো সব সময় ব্যবস্থাপনার নতুন চিন্তার উদ্ভাবন করে। ফলে ইংল্যান্ডের ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে। ইংল্যান্ডের ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদেরকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

যুক্তরাজ্যের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

Features of Management System in England

যুক্তরাজ্য একটি শিল্পোন্নত দেশ। এ দেশের উন্নত ব্যবস্থাপনার উপর শিল্পোন্নতি নির্ভরশীল। এ দেশের ব্যবস্থাপনার কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ:

১. **যৌথ ব্যবস্থাপনা (Combined Management):** যুক্তরাজ্যে শ্রমিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি যৌথ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্র তৈরি হয়। ফলে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তুষ্টি থাকে না। এতে সুষ্ঠু কাজের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

২. **পরিকল্পনা (Planning):** যুক্তরাজ্যের ব্যবস্থাপনার আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো- দক্ষতার সাথে পরিকল্পনা করা। এ দেশের ব্যবস্থাপকরা সব সময় বিভিন্ন রকম অনুসন্ধানের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে সেই তথ্যের ভিত্তিতে একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করে। এই পরিকল্পনা যত নির্ভুল হয়, ব্যবস্থাপনা তত উন্নত হয়।

৩. **পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ (Product Quality Control):** প্রত্যেক শিল্পের ব্যবস্থাপকরা তার উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চায়। কারণ, পণ্যের মানের উপর ঐ প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ভর করে।

৪. **ব্যবস্থাপকদের ক্ষমতা (Managers Labour):** প্রতিষ্ঠানের সাফল্য ব্যবস্থাপকদের কর্মদক্ষতা ও পূর্বের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। এই জন্য ব্যবস্থাপককে মেধাবী হতে হয়। যুক্তরাজ্যে এ ধরনের মেধাবী ব্যবস্থাপক শিল্প উন্নতির প্রধান হাতিয়ার।

৫. **ব্যবস্থাপকদের পরিশ্রম (Managers Labour):** ব্যবস্থাপকদের প্রচুর পরিশ্রমী হতে হয়। তারা পরিশ্রমের মাধ্যমে শ্রমিকদের কাজের পর্যবেক্ষণ করে থাকে। ফলে শ্রমিকরা কাজে অবহেলার সুযোগ পায় না। ব্যবস্থাপকরা পরিশ্রমের মাধ্যমে শিল্পের সমস্যা সমাধান করে।

৬. **শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রেষণা প্রদান (Motivational Staff):** শ্রমিক-কর্মীরা মাঝে মধ্যে তাদের কাজের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তারা কাজে মনোযোগী হতে পারে না, ব্যবস্থাপকরা তাদের ভেতর কাজের আগ্রহ সৃষ্টি করে কাজের প্রতি মনোযোগী করে তোলে। এই জন্য ব্যবস্থাপনা প্রেষণামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে। যেমন: বোনাস, অতিরিক্ত মজুরি, অবসর ভাতা ও ভ্রমণ ভাতা ইত্যাদির ব্যবস্থা করে।

৭. **কর্মীদের পদোন্নতি (Promotion):** ইংল্যান্ডে দুইভাবে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। ক. বয়সের ভিত্তিতে, খ. দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে। বয়সের ভিত্তিতে কর্মচারীদের একটি নির্দিষ্ট বয়সের পর পদোন্নতি দেওয়া হয়। অন্যদিকে কিছু কিছু শ্রমিককে কর্মদক্ষতার উপর ভিত্তি করে পদোন্নতি দেওয়া হয়।

৮. **ব্যবস্থাপনার পর্যায় (Level Management):** ইংল্যান্ডের ব্যবস্থাপনা তিনটি স্তরে বিভক্ত। ক. উচ্চ ব্যবস্থাপক যেমন: CEO, অর্থ পরিচালক ইত্যাদি দ্বারা উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। খ. মধ্য ব্যবস্থাপক; যেমন: বিভাগীয় প্রধান, বিক্রয় ব্যবস্থাপক, শ্রমিক ব্যবস্থাপক ও যারা উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গ. নিম্ন ব্যবস্থাপক; যেমন: আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, উৎপাদন ব্যবস্থাপক, যারা শ্রমিক-কর্মচারীদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেয় এবং প্রতিষ্ঠানের স্বার্থকে গুরুত্ব দেয়।

৯. **প্রতিষ্ঠানের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া (Upholding Interest of the Institute):** প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের একটি নিজস্ব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। ব্যবস্থাপকদের উচিত ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য না দিয়ে দলীয় স্বার্থের দিকে লক্ষ্য দেওয়া। যেন প্রতিষ্ঠান লক্ষ্য পূরণ করতে সক্ষম হয়। যুক্তরাজ্যের ব্যবস্থাপনা তা-ই করে থাকে।

১০. **শৃঙ্খলা (Discipline):** ব্যবস্থাপনার একটি বৈশিষ্ট্য হলো শৃঙ্খলা রক্ষা করা। প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক বা কর্মচারীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে প্রতিষ্ঠান কখনোই মূল লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে না। এ জন্য সবকিছুর মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় থাকতে হবে।

১১. **তত্ত্বাবধান (Supervision):** ইংল্যান্ডের ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবধান স্তর অনেক বেশি কঠোর ও শৃঙ্খলিত। উক্ত পদ্ধতিতে প্রত্যেক কর্মী ও নির্বাহীকে কাজের জন্য অবশ্যই জবাবদিহি করতে হয়। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরে জবাবদিহিতা ও তত্ত্বাবধান বিদ্যমান।

১২. **নেতৃত্বের ধরন (Types of Leadership):** যুক্তরাজ্যের ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব সাধারণত পিতৃতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক। এই ক্ষেত্রে ক্ষমতা অনেকাংশেই কেন্দ্রীভূত থাকে এবং শ্রমিকদের মতামতকে খুব বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় না। তবে উচ্চ ব্যবস্থাপনা কর্মীদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন।

১৩. **বেতন ও মজুরি ব্যবস্থা (Salary & Wages System in UK):** যুক্তরাজ্যের মজুরি ব্যবস্থা অন্য দেশ থেকে কিছুতা আলাদা। এখানে উচ্চ মজুরি প্রথা চালু রয়েছে; অর্থাৎ, নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দক্ষতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তাই বেতনের ক্ষেত্রে উচ্চ মজুরি প্রথার প্রচলন রয়েছে।

১৪. **Key Performance অনুসরণ (Follow Key Performance):** যুক্তরাজ্যের ব্যবস্থাপকরা Key Performance (KP's) এর নির্দেশনাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখেন এবং যথাযথ অনুসরণের প্রতি সতর্ক থাকেন।

১৫. **প্রতিবেদন প্রদান (Submitting Report):** যুক্তরাজ্যের ব্যবস্থাপনা পরিবেশের প্রতি অত্যাধিক সচেতনতা লক্ষ্য করা যায় এবং এই ক্ষেত্রে দুটি রিপোর্ট কে প্রাধান্য দিয়ে থাকে তা হলোঃ

ক. বাধ্যতামূলক প্রতিবেদন (Mandatory Report)

খ. স্বেচ্ছামূলক প্রতিবেদন (Voluntary Report)

Voluntary Report এর মধ্যে CSR ও CR এবং Mandatory Report এ পরিবেশের উপর কোনো ক্ষতিকর প্রভাব না পড়ে তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, যুক্তরাজ্যে আধুনিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত উপাদানগুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

যুক্তরাজ্যের ব্যবস্থাপনা পরিবেশ

Environment of UK Management

যুক্তরাজ্যেই প্রথম শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটেন পৃথিবীর কারখানা হিসাবে পরিচিত হয়। ১৮৫০ সালের দিকে বৃটেন ইউরোপের অন্যান্যদেশের তুলনায় অনেক এগিয়ে যায়। পরবর্তীতে যুক্তরাজ্য তাদের এই উন্নয়নেরর ধারাকে অব্যাহত রাখে। যাহোক, যুক্তরাজ্যের ব্যবস্থাপনা পরিবেশ নিম্নরূপঃ

১. **রাজনৈতিক পরিবেশ (Political Environment):** যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক স্থিতিশীল। বিশেষ করে শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী সময়ে স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

২. **অর্থনৈতিক পরিবেশ (Economic Environment):** যুক্তরাজ্য যদিও শিল্পোন্নত দেশ তা সত্ত্বেও বর্তমানে এর অগ্রগতিতা কিছুতা ধীর। ইংল্যান্ডের শিল্পের মধ্যে যান্ত্রিক শিল্প যেমন: অটোমোবাইল, এয়ার ক্রাফট ইত্যাদি এদের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক শহর হিসাবে খ্যাত সিটি অব লন্ডন ইংল্যান্ডের অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। যুক্তরাজ্যে মূলধন বাজার আইন, পরিবেশগত আইন, ভোক্তা বাজার, শ্রমআইন শক্তভাবে পরিচালনা করতে হয়। ইংল্যান্ডের অন্যান্য শিল্পের সাথে সেবা শিল্পে প্রসার ঘটেছে।

৩. **জনসংখ্যাগত পরিবেশ (Public Environment):** ইংল্যান্ডের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে এবং পরিবেশগত স্বচ্ছতার কারণে উন্নয়নশীল তথা বহু উন্নত দেশ থেকেও ইংল্যান্ডে অভিবাসনের জন্য পাড়ি জমাচ্ছে। ফলে বর্তমানে ইংল্যান্ডে কর্মসংস্থানের উপর চাপ বেড়েছে।

৪. **সাংস্কৃতিক পরিবেশ (Cultural Environment):** সাংস্কৃতিকভাবে ইংল্যান্ড একটি সমৃদ্ধশালী দেশ। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ ইংল্যান্ডে পাড়ি জমায়। সাংস্কৃতিক প্রভাবে যুক্তরাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা দৃঢ় হচ্ছে।

৫. **আইনগত পরিবেশ (Legal Environment):** ইংল্যান্ডের আইনগত পরিবেশের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র বিরাজমান। তবে এখানে রাজতন্ত্রের ঐতিহ্যও রয়েছে। শিল্পীয় গণতন্ত্রের বিকাশে ইউনিয়ন বা CBA যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ চীন ও যুক্তরাজ্যের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

জামার্নি বিশ্বের শিল্পায়িত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। এটি ইউরোপের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক শক্তি। উন্নত প্রযুক্তিই জামার্নির শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উন্নতির মূল কারণ। তবে উন্নত প্রযুক্তির পাশাপাশি জার্মানির ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শিল্পের উন্নয়নে অবদান রাখে। জামার্নিতে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বলতে সহ-নির্ধারণ পদ্ধতিকে (Co-ordination System) বুঝায়। এক্ষেত্রে শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বলে এটিকে সহ-নির্ধারণ পদ্ধতি বলে। এ ব্যবস্থায় শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে খুবই ঘনিষ্ট ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে সুসম্পর্কের কারণেই শিল্পপ্রতিষ্ঠানে উৎপাদন ব্যহত হয় না। এ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপকের ভূমিকা হলো একজন শ্রমিকের মত। অর্থাৎ ব্যবস্থাপক একজন দক্ষ শ্রমিক এবং তিনি শ্রমিকদের একজন সাহায্যকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। আর তাই শ্রমিক-ব্যবস্থাপকদের সম্পর্ক ঊর্ধ্বতন-অধঃস্তন নয় বরং সহ-অবস্থানেরও সহ-নির্ধারণের হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, এ সম্পর্কই জার্মানির ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মূল বিশেষত্ব। চীন সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক দেশ। এটি বিশ্বের একটি জনবহুল দেশ। এর আয়তন ৯৬০০,০০০ বর্গ কি. মি. এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১৫০ কোটি। যেহেতু এটি সমাজতান্ত্রিক দেশ, তাই এর প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনার ধরন অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ধরনের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। চীনের প্রতিষ্ঠানগুলোতে মূলতঃ শ্রমিকদেরকে প্রতিষ্ঠা করাই ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য। তাই সমাজতান্ত্রিক উপায়ে ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালিত হয়ে থাকে। সরকার কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে থাকে। সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অর্থাৎ সর্বত্রই কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করা হয়। যুক্তরাজ্য একটি শিল্পন্নোত দেশ। এ দেশের উন্নত ব্যবস্থাপনার উপর শিল্পোন্নতি নির্ভরশীল। এ দেশের ব্যবস্থাপনার কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপঃ ১. যৌথ ব্যবস্থাপনা ২. পরিকল্পনা ৩. পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ৪. ব্যবস্থাপকদের ক্ষমতা ৫. ব্যবস্থাপকদের পরিশ্রম ৬. শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রেষণা প্রদান ৭. কর্মীদের পদোন্নতি ৮. ব্যবস্থাপনার পর্যায় ৯. প্রতিষ্ঠানের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া ১০. শৃঙ্খলা ১১. তত্ত্বাবধান ১২. নেতৃত্বের ধরন ১৩. বেতন ও মজুরি ব্যবস্থা ১৪. Key Performance অনুসরণ ১৫. প্রতিবেদন প্রদান।

পাঠ-৫.৭ ভারতের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

Management System of India

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভারতের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ভারতের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

Management System of India

ভারত পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম জনবহুল এবং আয়তনে সপ্তম বৃহত্তম দেশ। অতীতে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা কৃষিনির্ভর ছিল। তাউপর ১৮৫৭ সালের পর ভারত ব্রিটেনের দখলে চলে যায়। এউপর থেকে ভারতে ধীরে ধীরে শিল্পের বিস্তার ঘটতে থাকে। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো ছিল ইংল্যান্ডের আইন অনুযায়ী। এউপর ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হয়। এউপর থেকে ভারত স্বাধীনভাবে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়তে শুরু করে। কিন্তু সেই যুক্তরাজ্যের ব্যবস্থাপনার পদ্ধতির প্রভাব ভারতের ব্যবস্থাপনার পদ্ধতির উপর পড়ে। ভারত সব সময় ইংল্যান্ডসহ পশ্চিমা বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে।

ভারতের ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য

Characterstics of Management System in India

যদিও ভারতের ব্যবস্থাপনার উপর ব্রিটেনের ব্যবস্থাপনার প্রভাব পড়ে। তা সত্ত্বেও ভারতের ব্যবস্থাপনার কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। এগুলো নিম্নরূপ:

১. **অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা (Participatory Management):** ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্তগ্রহণ করা যায় তাকে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা বলে। এখানে শ্রমিকরা ব্যবস্থাপকদের সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরামর্শ প্রদানে সাহায্য করে। এতে শ্রমিকরা কাজে বেশি আগ্রহ পায়।

২. **সহজলভ্য শ্রমিক (Available Labour):** ভারতে ১২০ কোটির বেশি লোকের বসবাস। ফলে এ দেশে অনেক সহজে শ্রমিক পাওয়া যায়। বর্তমানে ভারত শিল্পে অনেক অগ্রসর। এই বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যাকে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা ব্যবস্থাপনার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য।

৩. **দক্ষতা (Efficiency):** ব্যবস্থাপনা একটি কঠিন কাজ। এই কাজ পরিচালনা করার জন্য ব্যবস্থাপকদের অনেক বেশি দক্ষ হতে হয়। কারণ, ব্যবস্থাপকরা শ্রমিক-কর্মচারীদের মনোভাব বুঝে তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেয়। অন্যদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হলে ব্যবস্থাপককে বেশি দক্ষ হতে হবে।

৪. **পণ্য বা সেবার মানোন্নয়ন (Quality Development of Product or Services):** ভারতীয় ব্যবস্থাপকরা পরিশ্রমে বিশ্বাসী। তাই তারা উৎপাদনশীল কাজকর্মে স্বত:স্ফূর্ত মনোনিবেশ করে পণ্য বা সেবার গুণগত মানের উত্তরোত্তর উন্নয়ন করছে।

৫. **প্রেষণাদান (Motivation):** ভারতীয় ব্যবস্থাপনা পরিষদ কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের জন্য উন্নত আকর্ষণীয় প্রেষণামূলক কর্মসূচির ব্যবস্থা করে থাকে। যার কারণে সকলেই কর্ম সম্পাদন প্রক্রিয়ায় স্বত:স্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

৬. **পদোন্নতি (Promotion):** ভারতে জ্যেষ্ঠতার চাইতে কর্মদক্ষতার উপর ভিত্তি করে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। ফলে অদক্ষ ও অনভিজ্ঞ ব্যবস্থাপকরা ব্যবস্থাপনার উচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পারে না।

৭. **শ্রম ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক (Labour Management Relations):** বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভারতে শ্রমিক-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক তেমন ভালো না হলেও বর্তমানে অনেক উন্নত। বর্তমানে ব্যবস্থাপকরা একদিকে শ্রমিক অন্যদিকে তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে শ্রমিক-কর্মীদের সহায়তা করে। এতে শ্রমিক-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক উন্নত হয়।

ভারতের ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি

Managerial Funcitons of Indian Management

এ কথা স্বীকার্য যে, ভারতীয় ব্যবস্থাপকগণ তুলনামূলক সুবিধা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। ভারতীয় ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি, পরিচালনা ও নির্দেশনার দক্ষতা ও যোগ্যতা আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। তাই তো জন্ম হয়েছে টাটা, বিরলা, রিলায়েন্স কোম্পানির মত বিশ্ব স্বীকৃত কোম্পানিসমূহ। এছাড়া আধুনিক প্রযুক্তির সফল ব্যবহার ও বাস্তবভিত্তিক কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থাপনার গুণগত মানকে বহুগুণ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে। যাহোক, ভারতীয় ব্যবস্থাপনার আলাদা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কিছু ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. **দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা (Long Term Plaanning):** ভারতীয় ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পনার ধরন অধিকাংশ ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি হয়। টাটা, রিলায়েন্স এর মতো কোম্পানিগুলো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। তবে তার অর্থ এই নয় যে, সব কোম্পানি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করার সামর্থ্য রাখে। যে সকল ছোট বা মাঝারি ধরনের কোম্পানি রয়েছে যারা স্বল্প বা মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। এমন কিছু ভারতীয় কোম্পানি রয়েছে যারা শুধু একবার ব্যবহারের জন্য এ কার্যিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। তবে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা থেকে কোম্পানি দীর্ঘমেয়াদি সুবিধা অর্জন করে থাকে। তবে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপকের প্রয়োজন হয় যা একেবারে সহজলভ্য হয়।

২. **ভিশন ও মিশন নির্ধারণ (Setting Vission & Mission):** প্রত্যেক ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান কাজ হলো কোম্পানির জন্য ভিশন ও মিশন নির্ধারণ করা। কোম্পানিকে অবশ্যই নির্ধারণ করতে হবে যে, দীর্ঘমেয়াদে তারা কী অর্জন করতে চায়। ভিশন নির্ধারণ করার পর তা কীভাবে অর্জিত হবে সে সংক্রান্ত যাবতীয় পদক্ষেপসহ মিশন নির্ধারণ করতে হবে। মিশনের মধ্যে সংগঠনের যাবতীয় পদ্ধতির উল্লেখ থাকবে যে, কীভাবে ভিশন অর্জন করা হবে। বর্তমান ভারতীয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অনেক দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপক রয়েছে যারা প্রতিনিয়ত তাদের মধ্যে মেধা, অভিজ্ঞতা, মননশীলতা, প্রয়োগ করছেন সংগঠনের ভিশন অর্জন করার জন্য। তবে সংগঠনের ভিশন হতে হবে অবশ্যই বাস্তবায়নযোগ্য ও বাস্তবসম্মত। শুধু একদল ভিশনারি ব্যবস্থাপকের কল্যাণে ভারতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক।

৩. **উচ্চ দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্ব (High Skills & Capable Leaders):** কোনো সংগঠনের ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজন দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্ব। নেতৃত্বের কাজ হলো পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য শ্রমিক-কর্মীদের এমনভাবে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত করা যাতে তারা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ভারতীয় ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা ও যোগ্যতা আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে শুরু করে উদ্দেশ্য অর্জন বা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যন্ত সব ক্ষেত্রে আজ তারা যোগ্যতা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছে।

৪. **প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ কর্মিসংস্থান (Staffing of trained & Experienced Human Resource):** যে কোনো ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মী প্রয়োজন। ইংরেজি ও কম্পিউটারে অত্যন্ত দক্ষ হওয়ায় ভারতীয় শ্রমিক-কর্মীদের কদর আজ বিশ্বব্যাপী। সাধারণ কাজ থকে শুরু করে উচ্চতর যে-কোনো কাজের উপযোগী করে ভারতে কর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ফলে নিজ দেশের পাশাপাশি বিশ্ববাজারেও তাদের শ্রমিকদের শ্রমের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫. **যথাযথ কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব (Proper Authority & Responsibility):** কোনো কর্মী বা ব্যবস্থাপককে বিশেষ কোনো দায়িত্ব প্রদান করলে তাকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব প্রদান করতে হবে। ভারতীয় ব্যবস্থাপনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো- দায়িত্ব দেওয়ার পাশাপাশি যথাযথ কর্তৃত্ব প্রদান করা। কারণ, সঠিক কর্তৃত্ব ছাড়া কোনো ব্যবস্থাপকের পক্ষে সঠিকভাবে যাবতীয় কার্যাবলি সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। ভারতীয় ব্যবস্থাপনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো- সামান্য

একজন সুপারভাইজারকেও তার জন্য প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব দেওয়া হয়। ফলে যে কোনো পরিকল্পনার দ্রুত বাস্তবায়নে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করতে পারে।

৬. **পরিবেশের উপাাদানগুলোর মূল্যায়ন (Evaluation of Environmental Elements):** ব্যবস্থাপনার সফলতার জন্য পরিবেশগত উপাদানগুলো অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। কারণ, ব্যবস্থাপনা কার্যাবলির উপর পরিবেশগত উপাদানগুলোর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। যেমন: ভারতীয় সাধারণ ক্রেতাদের সম্পর্কে বলা হয় যে তারা পণ্য ক্রয়ের সময় খুব বেশি দর কষাকষি করে বা সস্তা দামের পণ্যটা ক্রয় করার চেষ্টা করে। অতএব ব্যবস্থাপককে অবশ্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে, কীভাবে গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য কম মূল্যে ক্রেতার কাছে পৌছানো যায়। এ কারণে ভারতীয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি এবং বাহ্যিক দুর্বলতা হ্রাসের মাধ্যমে কোম্পানিগুলো প্রতিযোগিতা মোকাবিলা করার মতো যোগ্যতা অর্জন করছে। ভারতীয় উদার অর্থনৈতিক নীতির কারণে ব্যবস্থাপনার সব স্তরে গুণগত মান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

৭. **সার্বজনীন (Universal):** ব্যবস্থাপনা একটি সর্বজনীন কর্মপন্থা যা সব দেশে সমানভাবে প্রযোজ্য। পরিকল্পনা, সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণের সংস্থাগত ভাষা সব দেশের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে পার্থক্য রয়েছে ব্যবস্থাপনা কার্যাবলির প্রায়োগিক দিক থেকে। কারণ, পৃথিবীর সব দেশে ব্যবস্থাপনা সর্বজনীন হলেও কোম্পানির উদ্দেশ্য অর্জনের কৌশল ভিন্ন হতে পারে। আধুনিক ও উন্নত প্রয়োগ কৌশলের কারণে ভারতীয় ব্যবস্থাপনা আজ বিশ্বে নিজস্ব স্থান করে নিয়েছে। টাটা ও রিলায়েন্স কোম্পানি তার প্রকৃত উদাহরণ। অতএব বলা যায়, পৃথিবীর যে-কোনো ব্যবস্থাপনা বা দলগত প্রচেষ্টা সর্বজনীন হলেও প্রায়োগিক পার্থক্য বিদ্যমান।

৮. **উদ্দেশ্য অর্জন প্রক্রিয়া (Goal Attainment Process):** পৃথিবীর যে কোনো কাজ বা প্রচেষ্টা ও ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য থাকে পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন করা। ব্যবস্থাপনার যাবতীয় কার্যাবলি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিচালিত হয়। কোনো উদ্দেশ্য যদি না থাকত তবে পরিকল্পনা, সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণের কোনো প্রয়োজন হতো না। ভারতীয় ব্যবস্থাপনা কার্যাবলির প্রতিটি স্তরে উদ্দেশ্য অর্জনকে সামনে রেখে পরিচালিত হয়।

ভারতীয় সরকারি ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য

Objectives of Public Management of India

ভারতের অধিকাংশ কোম্পানি ব্যক্তি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত। তার অর্থ এই নয় যে, সেখানে কোনো সরকারি ব্যবস্থাপনায় ব্যবসায়ী সংগঠন নাই। ভারতের অনেকগুলো ব্যবসায়ী ও শিল্প সংগঠন রয়েছে যার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব সরকারের হাতে। সরকারি ব্যবস্থাপনার মূলনীতি হলো- “মানব কল্যাণ, মুনাফা নয়।” বহুবিধ উদ্দেশ্য নিয়ে সরকার কিছু পণ্যদ্রব্য ও সেবা উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা নিজের হাতে রাখে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. **ব্যক্তিমালিকানার একচেটিয়ার অবসান (Elimination of Private Monpolies):** ভারতীয় সরকারি সংস্থাগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে ইচ্ছেমতো একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করতে না পারে। সরকারের কোনো সংস্থা যদি না থাকে সে ক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানা কোম্পানিগুলো স্বেচ্ছাচারী হওয়ার সুযোগ পায়। সরকারি সংস্থাগুলোর মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয়। তীব্র প্রতিযোগিতার যুগে ব্যক্তিমালিকানা কোম্পানিগুলো যেন একতাবদ্ধ বা কৌশলগত জোট গঠন করে দাম বাড়াতে না পারে সেই জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় কিছু কোম্পানি কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

২. **উৎপাদন ও যথাযথ সরবরাহে ভারসাম্য রক্ষা (Balanced Production & Proper Distribution):** ভারতের সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কোম্পানিগুলোর মূল উদ্দেশ্য থাকে উৎপাদন ও বাজার চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। সরকারের সঠিক সিদ্ধান্ত থাকলে কোনো ব্যক্তিমালিকানার কোম্পানি বা কোম্পানিগুলোর জোট একতাবদ্ধ হয়ে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দাম বৃদ্ধি করতে পারে না।

৩. **ক্রেতা ও ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষা (Saving of Consumer Interest):** ভারতে সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কোম্পানিগুলোর মূল উদ্দেশ্য জনসেবা করা। এটা বলা যাবে না যে, ভারতের সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত

কোম্পানিগুলো ঘুষ বা দুর্নীতি নাই। তবে তা অন্যান্য দেশের তুলনায় কম। ভারতের সব কোম্পানির ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য ক্রেতা ও ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষা করা, জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করা।

৪. **অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা (Cooperation to Economic Development):** সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত যে-কোনো সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গতিশীল করা। তবে সরকারিভাবে পরিচালিত ব্যবস্থাপনার নীতি ও পদ্ধতি হলো সর্বদা জনগণের কল্যাণের কথা মাথায় রাখা হয় এবং সরকারের অর্থনীতি যেন উন্নতি লাভ করতে পারে সে প্রচেষ্টা চালানো হয়।

৫. **অঞ্চল ভিত্তিক উন্নয়ন (Regional Development):** ভারত সরকারের বিচক্ষণ সিদ্ধান্তের কারণে এখন সব কলকারখানাকে বিভিন্ন প্রদেশ বা প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে সব এলাকায় সমান উন্নয়ন হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। কারণ, এলাকাভিত্তিক উন্নয়নের মাধ্যমে সমগ্র দেশের উন্নয়ন করা সম্ভব।

৬. **দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ (Long Term Investment):** ভারতের কোম্পানিগুলোর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যবস্থাপকদের ভিশন হলো দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ। কারণ, দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের ফলে নীতি ও কৌশল প্রণয়ন করা সহজ হয়। স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগের মাধ্যমে ঝুঁকিবিহীন মুনাফার কথা বিবেচনা করা হয়। তা ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

৭. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি (Creation of Employment):** প্রত্যেক সংগঠনের উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ব পালন করা। সমাজের কাছে দায়বদ্ধতা ও নিজেদের প্রয়োজনীয়তা থেকে ব্যবসায়ী ও সেবা সংগঠনগুলো কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে। সমাজে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি দেশ ও জাতি গঠনে কোম্পানিগুলো প্রভূত অবদান রাখে।

৮. **অধিক উৎপাদন (High Volume of Production): যে-কোনো** কোম্পানির ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য থাকে কম শ্রমিক ও মূলধন বিনিয়োগ করে যত বেশি পণ্য উৎপাদন করা যায়। কারণ, উৎপাদন খরচ যত কম থাকে মুনাফার পরিমাণ তত বেশি হয়। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সংগঠনের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের পথ সুগম হয়।

৯. **গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য সরবরাহ (Supply of Optimum Competition):** ব্যবস্থাপনার প্রথম দর্শন হওয়া উচিত গুণগত ও স্বাস্থ্যসম্মত টেকসই পণ্য ও সেবা সরবরাহ করা। পণ্যের মানের তুলনায় পণ্যের দাম কখন বেশি হওয়া উচিত নয়। প্রত্যেক সংগঠনের যে সেবার মানসিকতা থাকে তা কাজে লাগিয়ে কমমূল্যে গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে ক্রেতা ও ভোক্তাদের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করা।

১০. **ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি (Creation of Optimum Competition):** বাজারে যদি শুধু ব্যক্তিমালিকানার কোম্পানি বা কোনো পণ্যের সীমিত সংখ্যক উৎপাদনকারী কোম্পানি থাকে তবে বাজারে অসম প্রতিযোগিতা তৈরি হয়। বিশেষ করে একচেটিয়া ব্যবসায়ের সূচনা হতে পারে। অতএব ভারতীয় বাজারে ভারসাম্য প্রতিযোগিতা ধরে রাখার জন্য সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় কোম্পানি রয়েছে।

১১. **সামাজিক দায়িত্ব পালন (Performance of Social Responsibilities):** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূল্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয় মুনাফা অর্জন। ভারতের বহু কোম্পানি প্রমাণ করেছে যে মুনাফা করার পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ব পালন করা যায়। কারণ, প্রত্যেক কারবার সংগঠন কোনো না কোনো ভাবে সমাজের কাছে দায়বদ্ধ। ভারতের কোম্পানিগুলো এখন পরিবেশের নানা উপাদান নিয়ে যথেষ্ট সচেতন। ফলে কোম্পানিগুলো নানাভাবে সমাজকে সহায়তা করছে।

১২. **জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন (Development of Standard of Living):** কোম্পানি ব্যবস্থাপনার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে সাধারণ নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। সমাজে প্রতিটি পণ্যদ্রব্য ও সেবা কোনো না কোনো কোম্পানির মাধ্যমে উৎপাদিত যা মানুষের জীবনযাপনের অভ্যাসকে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন করে দিচ্ছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, ব্যবস্থাপনা সংগঠনের মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি সমাজের মানুষকে নানাভাবে সহায়তা করার দায়িত্ব ও মানসিকতা নিয়ে ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি পরিচালনা করে।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীরা ভারতের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনাপূর্বক বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করবেন।

সারসংক্ষেপ

ভারত পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম জনবহুল এবং আয়তনে সপ্তম বৃহত্তম দেশ। অতীতে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা কৃষিনির্ভর ছিল। তাউপর ১৮৫৭ সালের পর ভারত ব্রিটেনের দখলে চলে যায়। এউপর থেকে ভারতে ধীরে ধীরে শিল্পের বিস্তার ঘটতে করে থাকে। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো ছিল ইংল্যান্ডের আইন অনুযায়ী। এউপর ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হয়। এউপর থেকে ভারত স্বাধীনভাবে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়তে শুরু করে। কিন্তু সেই যুক্তরাজ্যের ব্যবস্থাপনার পদ্ধতির প্রভাব ভারতের ব্যবস্থাপনার পদ্ধতির উপর পড়ে। ভারত সব সময় ইংল্যান্ডসহ পশ্চিমা বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে। যদিও ভারতের ব্যবস্থাপনার উপর ব্রিটেনের ব্যবস্থাপনার প্রভাব পড়ে। তা সত্ত্বেও ভারতের ব্যবস্থাপনার কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। এগুলো নিম্নরূপ: ১. অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা ২. সহজলভ্য শ্রমিক ৩. দক্ষতা ৪. পণ্য বা সেবার মানোন্নয়ন ৫. প্রেষণাদান ৬. পদোন্নতি ৬. শ্রম ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক।

ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

১. এক মালিকানা ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কী?
২. পারিবারিক ও যৌথ পারিবারিক ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা বলতে কী বুঝায়?
৩. অংশীদারি ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
৪. যৌথ মূলধনি কোম্পানি কী? এর বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।
৫. কোম্পানির প্রকারভেদ আলোচনা করুন।
৬. প্রাইভেট ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।
৭. একজন পরিচালকের কী কী যোগ্যতা থাকা আবশ্যক?
৮. পরিচালক নিয়োগ পদ্ধতি আলোচনা করুন।
৯. পরিচালক কীভাবে অপসারণ করা যায়?
১০. পরিচালক পরিষদের কার্যাবলি আলোচনা করুন।
১১. পরিচালকদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করুন।
১২. একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যাবলি বর্ণনা করুন।
১৩. পরিচালকের পদ কীভাবে শূন্য হয়?
১৪. ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বর্ণনা করুন।
১৫. বাংলাদেশে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ধরন বর্ণনা করুন।
১৬. বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ধরন বর্ণনা করুন।
১৭. জাপানের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।
১৮. যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
১৯. দক্ষিণ কোরিয়ার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আলোচনা করুন।
২০. ফ্রান্সের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
২১. জার্মানির ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলো কী?
২২. যুক্তরাজ্যের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করুন।
২৩. ভারতের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলো কী? ভারতের ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি আলোচনা করুন।
২৪. ভারতীয় সরকারি ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যাবলি বর্ণনা করুন।

সহায়ক গ্রন্থ :

- JS Chandan, “Management Theory & Practice”, 2nd Edition, Vikas Publishing House Pvt. Ltd. New Delhi, 1995.
- Bazlul Hoque Khandoker, “Management Systems in Bangladesh & Japan: A Comparative Study.
- Michael & Brooke, “International Management : A Review of Strategy & Operation, McGraw-Hill, INC, USA.